www.BANGLAKITAB.com

দুনিয়াতে আসিয়া তিন দিন পর্যন্ত খোদার মেহ্‌মান থাকিব। খোদার নিকট এক হাজার বৎসরে এক দিন হয়। যেমন, আল্লাহ্ বলেনঃ

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

"আপনার প্রভুর নিকট একদিন তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বৎসরের সমান।" অতএব, আমরা তিন হাজার বৎসর পর্যন্ত জীবিকা উপার্জন হইতে একেবারে নিশ্চিন্ত। বয়স তিন হাজার বৎসর হইতে বেশী হইলে তখন চিন্তা করা যাইবে।

বাহ্যতঃ ইহা একটি রসাত্মক উক্তি মনে হয়। কিন্তু ইহা হইতে খোদাপ্রেমিকদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা দুনিয়ার কাজে চেষ্টা-তদবীর করা জরুরী মনে করেন না। কারণ, রুযীর দায়িত্ব খোদা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। আখেরাতের আমলসমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। আখেরাতের জন্য চেষ্টা-তদবীর না করিলেও তিনি জান্নাত দান করিবেন কিংবা তোমাদের দ্বারা আপনাআপনিই জান্নাতের কাজ করাইয়া লইবেন—এরূপ নহে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا

"কেহ নেক কাজ করিলে তাহা তাহারই উপকারে আসিবে এবং কেহ অসৎকাজ করিলে উহার কুফলও তাহার উপর বর্তিবে।" আল্লাহ্ পাক আরও বলেনঃ

اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ

"তোমরা পছন্দ না করিলেও কি আমি তোমাদের ঘাড়ে জান্নাত জোরপূর্বক চাপাইয়া দিব।"

অপর পক্ষে রিযিক সম্বন্ধে হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

وَمَنْ كَانَ لَهٗ رِزْقٌ فِىْ رَاْسِ جَبَلٍ اَوْ حَضِيْضٍ يَّاْتِ بِهِ اللّٰهُ

"কাহারও রিযিক পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা গভীর গর্তে নিহিত থাকিলেও আল্লাহ্ উহা পৌঁছাইয়া দেন।"

আশ্চর্যের বিষয়, এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা আখেরাতের আমল সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা করি না, উল্টা দুনিয়ার জন্য চিন্তায় মশ্‌গুল থাকি। অথচ উপরোক্ত পার্থক্যবশতঃ দুনিয়া বিন্দুমাত্রও মনোনিবেশের যোগ্য নহে; বরং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়ার জন্য চেষ্টা করা না-জায়েয করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খোদা অনুগ্রহবশতঃ দুনিয়ার জন্য উপায় অবলম্বন করার অনুমতি দান করিয়াছেন।

জীবিকার জন্য উপায় অবলম্বন করাঃ শুধু অনুমতি নয়; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দুনিয়ার জন্য চেষ্টা-তদবীর করা ফরযও করিয়াছেন। হাদীসে বলা হইয়াছেঃ طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ 'শরীঅতের মৌলিক ফরযসমূহের পর হালাল রুযী অন্বেষণ করাও একটি ফরয।' আমাদের সূক্ষ্মদর্শী বুযুর্গগণ রুযীর উপায় সম্বন্ধে এমনও বলিয়াছেন যে, কেহ হারাম চাকুরীতে লিপ্ত থাকিলে যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সে সাহসের সহিত অভাব-অনটনের মোকাবিলা করিতে পারিবে না, তবে তৎক্ষণাৎ হারাম চাকুরী ত্যাগ করা তাহার জন্য জরুরী নহে। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের নির্দেশ এই যে, প্রথমে হালাল চাকুরী খুঁজিয়া বাহির কর। তারপর হারাম চাকুরী

www.BANGLAKITAB.com

ত্যাগ কর। হালাল চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত হারাম চাকুরীই করিতে থাক এবং নিজকে গোনাহ্‌গার মনে করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাক।

কারণ, কেহ কেহ অভাব-অনটনে অতিষ্ঠ হইয়া খৃষ্টান, আর্য কিংবা কাদিয়ানী হইয়া যায়। মিথ্যা ধর্মাবলম্বীরা স্বদলে ভিড়াইবার জন্য মানুষকে অনেক প্রলোভন দেখায়। এমতাবস্থায় অভাব-অনটন সহ স্বধর্মে কায়েম থাকা সাহসী লোকদের কাজ। কেহ কেহ আবার অভাব-অনটনে পড়িয়া পীরী-মুরীদীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেয় এবং মানুষকে ধোঁকা দিতে থাকেঃ او خویشتن گمراہ است کرا رہبری کند "সে নিজেই গোমরাহ অন্যের হেদায়ত কিরূপে করিবে?"

আমি কিছুসংখ্যক লোককে পীর সাজিয়া ঘুরাফেরা করিতে দেখিয়াছি। তাহারা নিজ বাড়ীতে অবস্থানকালে নামাযও পড়ে না, অথচ বাহিরে যাইয়া ছুফী সাজিয়া যায়। এ সম্বন্ধে একটি মারাত্মক ঘটনা শুনা গিয়াছে যাহার কোন নযীর নাই।

আমার জনৈক মৌলবী বন্ধু বর্ণনা করেনঃ এলাহাবাদের জনৈক মূর্খ ব্যক্তি বর্ধমান জিলায় পীরী-মুরীদী করিত। সে ছিল পরভোজী ফকীর। বর্ধমানের জনৈক ধনী ব্যক্তি তাহার ফাঁদে পড়িয়া যায়। ধনী ব্যক্তিরা সাধারণতঃ দুনিয়া সম্বন্ধেই জ্ঞান রাখে, ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না। ফলে মূর্খ দরবেশ এবং ভণ্ড পীর ডাকাতদের ফাঁদে তাহারাই অধিকাংশ পড়িয়া থাকে। আমাদের শ্রদ্ধেয় হাজী সাহেব বলিতেন, যে দরবেশের চারিদিকে অধিকাংশ দুনিয়াদারদের ভিড় জমে, সে দরবেশ নহে; বরং সে-ও দুনিয়াদার। কেননা, কথায় বলে, الجنس یمیل الی الجنس "প্রত্যেক জাতি স্বজাতির প্রতিই আকৃষ্ট হয়।" তাহার মধ্যে পূর্ণ দ্বীনদারী থাকিলে দ্বীনদার ব্যক্তিরাই তাহার দিকে অধিক আকৃষ্ট হইত।

একটি হাদীসেও এই বিষয়টি উল্লিখিত রহিয়াছে। রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ আরবের নবীর অনুসারীদের মধ্যে কোন্ দলের লোক বেশী, ধনী—না দরিদ্র? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেনঃ 'দরিদ্র ব্যক্তিরাই অধিকতর তাঁহার অনুসরণ করে।' হিরাক্লিয়াস ইহা সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, সত্যই দরিদ্ররাই পয়গম্বরদের অনুসরণ করে। (ছাহাবাগণ হিরাক্লিয়াসের এই মন্তব্য খণ্ডন করেন নাই; বরং তাঁহারা চুপ ছিলেন। কাজেই ইহা দলীলে পরিণত হইয়া গিয়াছে।) খোদার শোকর, আমাদের বুযুর্গদের সিল্‌সিলায় দরিদ্র ও ছাত্রদের সমাবেশই বেশী। ধনী ও আমীরদের সংখ্যা খুব কম। যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও খাঁটি দ্বীনদার।

মোটকথা, একবার ঐ বাঙ্গালী বিত্তশালী ব্যক্তি কার্যোপলক্ষে এলাহাবাদ আসিলেন। তথায় পৌঁছিয়া তিনি মুর্শিদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন। গ্রামে পৌঁছিয়া দেখিলেন, জনৈক চৌধুরী চৌকিতে বসিয়া আছেন। খুব তা'যীমসহ পীরের নাম লইয়া তাহার অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে চৌধুরী উত্তরে বলিলেন, সে তো তাকিয়াদার (পরভোজী) ফকীর। আপনি তাহার খপ্পরে পড়িলেন কিরূপে? বাঙ্গালী সাহেব বলিলেন, আপনি যাহাই বলুন তিনি আমার মালিক ও মুর্শিদ। চৌধুরী বুঝিলেন, লোকটি কাণ্ডজ্ঞানহীন বটে। তিনি একটি চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, অমুক তাকিয়াদারকে এখানে ধরিয়া আন। বাঙ্গালী বলিলেন, হুযূরের সহিত এমন ধৃষ্টতা আমার পক্ষে শোভা পায় না। আমি স্বয়ং তাঁহার খেদমতে হাযির হইব। আপনি মেহেরবানীপূর্বক রাস্তা দেখাইবার জন্য চাকরকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দিন। অগত্যা চৌধুরী সাহেব চাকরকে তাহার সঙ্গে দিয়া দিলেন। ঐ ব্যক্তি এক কুড়ে ঘরে বাস করিত। বাঙ্গালী সাহেব তথায় পৌঁছিয়া

www.BANGLAKITAB.com

খুব তা'যীম সহকারে সালাম করিলেন ও ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুড়ে ঘরে তাহার সহিত আরও কতিপয় গুণ্ডা বদমায়েশ থাকিত। সর্বদা গাঁজা-ভাঙ্গ ইত্যাদি পান করিত। এতসব দেখিয়া-শুনিয়াও ধনী ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট হইল না। আসলে পীরী-মুরীদী ব্যবসাটিই এমন যে, একবার কাহারও সাধুতা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মিয়া গেলে তমীযা বিবির ওযূর ন্যায় তাহা কখনও নষ্ট হয় না।

তমীযা ছিল এক কুল্টা নারী। সে নামাযও পড়িত না। জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি তাহাকে নামায পড়িতে তাকীদ করিয়া ওযূ করাইয়া দিলেন। নামাযের অন্যান্য নিয়ম-কানূনও শিখাইয়া দিলেন। এক বৎসর পর বুযুর্গ ব্যক্তি আবার ফিরিয়া আসিয়া তমীযা বিবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নামায রীতিমত পড়িতেছ কিনা? তমীযা বলিল, হুযূর, দৈনিকই পড়িতেছি। বুযুর্গ ব্যক্তি আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, ওযূও কর কি? উত্তর দিল, হুযূর! যে ওযূ করাইয়াছিলেন, আজ পর্যন্ত তাহার দ্বারাই নামায পড়িতেছি।

তমীযার ওযূ পেশাব, পায়খানা, যিনা ইত্যাদি কোন কিছুতেই ভঙ্গ হইত না, (ওযূ নয় যেন লোহা আর কি!) তেমনি আজকালকার পীরী-মুরীদী একবার চালু হইয়া গেলে তাহা শরাব, যিনা, নামায-রোযা ত্যাগ, দাড়ি মুণ্ডানো, উলঙ্গ হইয়া চলাফেরা করা ইত্যাদি কোন কারণেই আর অচল হয় না। এমন কি কোন পীর যদি লেংটিও না পরে, তবে তাহার ভক্তের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। কোন পীর সর্বদা চুপ হইয়া থাকিলে তাহার নাম হয় 'চুপশাহ' বরং 'ফানাফিল্লাহ্'। আবলতাবল বকিলে তাহা কুফরী বাক্য হইলেও উহাকে নিগূঢ় তত্ত্ব মনে করা হয়। আর ঘটনাক্রমে কেহ দুই একটি শুদ্ধ কথা বলিয়া ফেলিলে তাহাকে 'মোহাক্কিক' ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়।

শরীঅত ও তরীকত দুইটি পৃথক জিনিস বলিয়া মানুষের যে বদ্ধমূল ধারণা জন্মিতেছে, উহাই এই সমস্ত ভ্রান্তির মূল কারণ। ফলে কোন পীর শরীঅতবিরোধী কাজ করিলেও মুরীদদের তাহাতে বিশ্বাস নষ্ট হয় না। তাহারা মনে করে, বোধ হয় ইহা তরীকতের কোন গূঢ়তত্ত্ব। আস্তাগ-ফিরুল্লাহ্..... আল্লাহ্ ক্ষমা করুন।

মোটকথা, উপরোক্ত ফকীর কয়েক দিন পর্যন্ত ধনী ব্যক্তিকে খুব আদর যত্ন করিয়া খাওয়াইল। দুই চারি দিন পর ধনী ব্যক্তি বিদায়ের অনুমতি চাহিলে সে অনুমতি দিয়া বলিল, আমি নিজে আপনাকে ষ্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিব। এই বলিয়া সে ও তাহার ভাই ধনী ব্যক্তিকে লইয়া ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হইল। তাহারা একটি নির্জন রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চলার পরও ষ্টেশন না পাওয়ায় ধনী ব্যক্তির মনে সন্দেহ দেখা দিল। তিনি বলিলেন, হুযূর, আমি যে পথে আসিয়াছিলাম ইহা তো সেই পথ নয়। ফকীর উত্তর দিল, আচ্ছা, আমি আপনাকে বাহিরে বাহিরে নিকটতম পথ দিয়াই লইয়া চলিতেছি। ইহাতে বেচারা চুপ হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা একটি জনপ্রাণীহীন জঙ্গলে পৌঁছিয়া গেল। সেখানে গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিলেও কেহ সাহায্যার্থে আসিতে পারিবে না।

তথায় পৌঁছিয়া ফকীর বলিল, সঙ্গে যাহাকিছু আছে, এখানে রাখিয়া দাও। ইহাতে বেচারা অপারগ অবস্থায় যথাসর্বস্ব তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিল। তাহারা তাহাকে পোশাক-পরিচ্ছদও খুলিয়া ফেলিতে বলিল। সে তাহাও করিল। এর পর তাহারা তাহাকে হত্যা করিতে মনস্থ করিল। সে করজোড়ে কাকুতি মিনতি সহকারে বলিল, আপনারা আমাকে হত্যা করিবেন না, আমি বাড়ী

www.BANGLAKITAB.com

পৌঁছিয়া আরও দ্বিগুণ টাকা আপনাদের নামে পাঠাইয়া দিব। তাহারা বলিল, এখন তোমাকে জীবিত ছাড়িয়া দেওয়া নিতান্তই অবিবেচকের কাজ হইবে। তুমি সমস্ত ভেদ খুলিয়া দিবে। ধনী ব্যক্তি অনেক কসম করিয়া বলিল, আমি কাহাকেও এই কথা জানাইব না। কিন্তু নিষ্ঠুর-প্রাণ ফকীর তাহার কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া একটি কূপে লাশ ফেলিয়া চলিয়া গেল।

ঘটনাক্রমে কিছুদিন পর জনৈক রাখাল ঐ কূপের ধারে পৌঁছিলে সে দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া কূপের ভিতর দৃষ্টিপাত করিতেই একটি ভাসমান লাশ দেখিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ থানায় সংবাদ দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া লাশ উদ্ধার করিল। তখন তাহাকে চিনিবার মত তথায় কেহ ছিল না। অবশ্য তাহার পকেট হইতে কিছু কাগজপত্র বাহির হইল। উহাতে বর্ধমানের ঠিকানা লেখা ছিল। আর কি চাই, প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য পুলিশের পক্ষে এতটুকুই যথেষ্ট। অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃত অবস্থা খুলিয়া গেল। পুলিশ ফকীরকে গ্রেফতার করিয়া তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিল। শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করিল যে, আমিই তাহাকে হত্যা করিয়াছি। অবশেষে বিচারে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইল।

জীবিকার অভাবে অপারগ হইয়া মানুষ অন্যান্য উপায়েও 'হুকুকুল এবাদ' (বন্দার হক) নষ্ট করিতে দ্বিধাবোধ করে না। কাহারও কাছ হইতে ধার করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, কাহারও আমানত গ্রহণ করিয়া পরে অস্বীকার করিয়া বসে, আবার কাহারও নিকট হইতে কিছু লইয়া তাহা বন্ধক রাখিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত আরও বহু কুকাণ্ড মানুষ করিয়া থাকে। ইহা স্পষ্ট কথা যে, হক্কুল-এবাদ নষ্ট করার অনিষ্টতা সংক্রামক হইয়া থাকে, যাহা ব্যক্তিগত অনিষ্ট হইতে অনেক মারাত্মক। কোন ব্যক্তি হারাম চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিলে যদি ঐ চাকুরীর করণীয় বিষয়ে অন্যের ক্ষতিসাধন করা হয়, তবে সে ব্যক্তিগতভাবে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সে অন্যান্য লোকদিগকে পেরেশান করিবে না। কিন্তু এই ব্যক্তি হালাল রুযী তালাশ না করিয়াই যদি হারাম চাকুরীটিও ছাড়িয়া দেয়, তবে অন্যের ক্ষতিসাধন করা ব্যতীত তাহার জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় থাকিবে না। এই কারণে বিচক্ষণ বুযুর্গগণ জীবিকা অর্জনের উপায়কে এত গুরুত্ব দেন যে, জীবিকার্জনের হারাম উপায়কেও কৌশলে ত্যাগ করাইয়া থাকেন। এমতাবস্থায় জীবিকার্জনের হালাল উপায় হইতে তাঁহারা কি করিয়া বিরত রাখিতে পারেন?

কোন কোন অবিবেচক লোক এই বুযুর্গদের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলে যে, তাঁহারা হারাম চাকুরী করিতে অনুমতি দেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা হারাম চাকুরীর অনুমতি দেন না; বরং তাঁহারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঈমান বাঁচাইতে চান। হারাম চাকুরী করিলে সে গোনাহ্‌গার হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু চাকুরী ত্যাগ করিলে ঈমান হইতে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া এখন সে নিজেরই ক্ষতি করিতেছে, চাকুরী ত্যাগ করিলে হয়তো অন্যান্যকেও বিপদে ফেলিয়া দিবে। ফেকাহ্‌র নীতি অনুযায়ী বড় অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষার জন্য ছোট অনিষ্টকে সহ্য করা যায়। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, এই নীতিকে কাজে লাগানোর অধিকার প্রত্যেকের নাই। একমাত্র বিচক্ষণ আলেম ব্যক্তিই ইহার যথার্থ প্রয়োগস্থল বুঝিতে পারেন।

নফ্‌সের বাহানাঃ আমি বলিতেছিলাম যে, ধর্মীয় উপায়সমূহের মোকাবিলায় সাংসারিক উপায়াদি চেষ্টা-তদবীরের যোগ্য নহে। দুনিয়ার জন্য এত চেষ্টা-তদবীর করা, যাহাতে আখেরাতের চেষ্টা বাদ পড়িয়া যায়, তাহা আরও জঘন্য ব্যাপার। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ মুসলমান দুনিয়ার

www.BANGLAKITAB.com

জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা-তদবীর করা জরুরী মনে করে; কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে কোন উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় মনে করে না। তবে যাহারা ধর্মকেই প্রয়োজনীয় মনে করে না তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। যাহারা ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াও উহার জন্য উপায় অবলম্বন করে না—আমার অভিযোগ তাহাদের সম্বন্ধেই। তাহারা বুযুর্গদের দরবারে যাতায়াত করে, কিন্তু ধর্ম অর্জনের উপায় জিজ্ঞাসা করে না। এক তাওয়াজ্জুতেই কামেল বানাইয়া দেওয়ার জন্য বুযুর্গদিগকে অনুরোধ করাই তাহাদের বড় জোর চেষ্টা। তাহাদের ধারণা, বুযুর্গগণও এইভাবেই বুযুর্গ হইয়াছেন। আমি বলি, এখানেই ফয়সালা হইবে। বুযুর্গদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা শুধু তাওয়াজ্জুহের বরকতেই কামেল হইয়াছেন, না কিছু কাজও করিতে হইয়াছে? যদি তাহারা শুধু তাওয়াজ্জুহের বরকতেই কৃতকার্য হইয়া না থাকেন, তবে তাহাদের কাছে এরূপ দরখাস্ত করার অধিকার আপনি কোথায় পাইলেন?

বন্ধুগণ, এসব নফ্সের বাহানা বৈ কিছুই নহে; নফ্স আপনাকে ধোঁকায় ফেলিয়া গোমরাহ্ করিতে চায়। সাহসের অভাব এবং ধর্মীয় ব্যাপারে উদাসীনতা হইতে ইহার উৎপত্তি। ফলে আমরা দুনিয়ার কাজের যতটুকু চেষ্টা করিয়া থাকি ধর্মীয় কাজের জন্য ততটুকু চেষ্টা করি না।

আল্লাহ্র সহিত বাক্যালাপঃ কেহ কেহ রৌদ্রের কারণে জমাআতের নামায ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু সেই সময় যদি তাহাদিগকে কোন উপরিস্থ সরকারী কর্মচারী ডাকিয়া পাঠায়, তবে রৌদ্রের পরওয়া না করিয়া ঠিক দুপুর বেলায় তথায় পৌঁছিয়া যাইবে। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রৌদ্রের অভিযোগ করা দূরের কথা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ ঘটার গর্বে বুক ফুলিয়া যায়। সাহেবের সহিত দীর্ঘ আলাপ হইয়াছে, অমুক মোকদ্দমা সম্বন্ধে এই এই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ইত্যাদি বলিয়া বলিয়া গর্ব করা হয়। অথচ ইহা মোটেই গর্বের বিষয় নহে। সরকারী কর্মচারীরা তোমাদের মতই মানুষ নহে কি? অথচ ইহাই ছিল গর্বের কথা যে, নামাযে পরম প্রভু আল্লাহ্র সহিত কথাবার্তা হয়। আমরা এরূপ যোগ্য নহি যে, হক তা'আলা আমাদের সহিত কথা বলিবেন। এমন কি আমরা তাঁহার পবিত্র নাম মুখে উচ্চারণ করারও যোগ্যতা রাখি না।

هزار بار بشويم دهن بمشك وگلاب ــ هنوز نام تو گفتن كمال بے ادبى است

"মেশ্ক ও গোলাপ দ্বারা হাজার বার মুখ ধৌত করিলেও তোমার নাম মুখে উচ্চারণ করা চরম ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নহে।" কিন্তু হক তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহবশতঃ আমাদিগকে নামাযে তাঁহার সহিত যে কোন সময় কথা বলার অনুমতি দান করিয়াছেন। তিনি আমাদের কথার প্রতি মনোযোগও দেন। আমাদের আবেদন-নিবেদনের উত্তর দেন। এছাড়া তিনি নামাযে কোরআন শরীফ পাঠ করার অনুমতি দিয়াছেন; বরং ইহা ফরয করিয়াছেন। কোরআন খোদারই কালাম। এইভাবে তিনিও যেন আমাদের সহিত কথাবার্তা বলেন। আরও অনুগ্রহ এই যে, তিনি আমাদিগকে তাঁহার আসল নাম ধরিয়া ডাকিতে অর্থাৎ, 'ইয়া আল্লাহ্' বলিয়া ডাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। দুনিয়ার কোন শাসনকর্তাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া দেখুন, তৎক্ষণাৎ সর্বপ্রধান অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া যাইবেন। তাঁহার নামও এত সহজ যে, শিশু সর্বপ্রথম 'আল্লাহ্' নাম শিখিয়া লয়। পরিতাপের বিষয়, এমনি দয়ার আধার ও মহান খোদার সহিত কথাবার্তা বলিবার জন্য মানুষ রৌদ্রের বাধা ডিঙ্গাইতে পারে না। আর অহেতুক জমাআতের নামায ছাড়িয়া দেয়।

www.BANGLAKITAB.com

এবাদত কবূল হওয়ার লক্ষণঃ খোদার আরও একটি বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, তিনি আমাদের অসম্পূর্ণ এবাদতও কবূল করিয়া লন। যদি বলেন, আমাদের অসম্পূর্ণ এবাদত যে কবূল হয় তাহা কিরূপে বুঝা গেল ? তবে শুনুন, হযরত হাজী সাহেব (রঃ) ইহার একটি লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, আপনি যদি কাহারও আগমনে বিরক্তি বোধ করেন, তবে সামর্থ্য থাকিলে তাহাকে দ্বিতীয়বার আপনার নিকট আগমন করিতে দেন না, ইহাই নিয়ম। সেমতে আপনার প্রথম এবাদত খোদার নিকট অপছন্দনীয় হইয়া থাকিলে তিনি পরবর্তী সময় আপনাকে মসজিদেই প্রবেশ করিতে দিতেন না—নামাযেরও তওফীক দিতেন না। অথচ একবার নামায পড়ার পর পরবর্তী সময়ও আপনার নামায পড়ার তওফীক হয়। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, আপনার পূর্বের নামায কবূল হইয়াছে। অন্যান্য এবাদতের বেলায়ও এইরূপ বুঝিয়া নিন।

সত্যই তিনি কত সুন্দর কথা বলিয়াছেন, ইহা যদিও অকাট্য দলীল নহে, তথাপি হক তা'আলার প্রতি এইরূপ ধারণা পোষণ করিতে থাকিলে কবূল হওয়ার নিশ্চিত আশা করা যায়। কারণ, হাদীসে কুদ্‌সীতে বলা হইয়াছেঃ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ "বান্দা আমার নিকট যেরূপ আশা পোষণ করে, আমি তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি।" হক তা'আলা আপনাকে দৈনিক পাঁচ বার মসজিদে আসার তওফীক দিয়াছেন। অথচ তাঁহার অন্যান্য আরও বহু বান্দা আছে, তাহাদের বৎসরে একবারও মসজিদে আসার তওফীক হয় না। ইহার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, হক তা'আলা তাহাদের মসজিদে আসা পছন্দ করেন না।

জনৈক গণ্ড মূর্খ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদা তাহার একটি বাছুর মসজিদে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে মোল্লাজী রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—লোকেরা নিজেরা তো রোযা-নামায করেই না, অথচ জন্তু জানোয়ারকে মসজিদে ঢুকাইয়া দেয়। ইহার উত্তরে গণ্ড মূর্খ ব্যক্তি মোল্লাজীকে বলিতে লাগিল, বকবক করিতেছ কেন ? অবুঝ জানোয়ার বলিয়াই তো মসজিদে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আমাকে কোন দিন মসজিদে আসিতে দেখিয়াছ কি ? দেখুন, ইহাকেই বলে তওফীক না হওয়া।

তদ্রূপ জনৈক মনিব ও চাকরের একটি গল্প আছে। একদা তাহারা প্রয়োজনবশতঃ বাজারে যাইতেছিল। পথে নামাযের সময় হওয়ায় চাকর মালিকের নিকট নামায পড়ার অনুমতি চাহিল। মনিব অনুমতি দানকরতঃ বলিল, তাড়াতাড়ি নামায পড়িয়া চলিয়া আস। আমি মসজিদের বাহিরে তোমার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। খোদার কুদরত দেখুন, তিনি চাকরকে মসজিদে প্রবেশের শক্তি দিলেন, কিন্তু মনিব বাহিরেই আটকা পড়িয়া গেল। চাকর খুব নিশ্চিন্ত মনে ফরয, নফল ইত্যাদি আদায় করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মসজিদের অন্যান্য নামাযীরা নামায সমাপ্ত করিয়া চলিয়া গেল। মনিব বাহিরে অপেক্ষা করিতে করিতে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। সকলের শেষে এক ব্যক্তিকে মসজিদ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন মসজিদে কতজন লোক রহিয়াছে ? উত্তর হইল, মাত্র একজন। মনিব মনে করিল, আর বোধ হয় দেরী হইবে না, সত্বরই চলিয়া আসিবে। কিন্তু চাকর নির্জনতা পাইয়া ওযীফা আরম্ভ করিয়া দিল। অবশেষে অতিষ্ঠ হইয়া মনিব ডাকিয়া বলিল, আরে কোথায় আছ, বাহিরে আস না কেন ? চাকর উত্তর দিল, আমাকে আসিতে দেয় না। মনিব বলিল, কে আসিতে দেয় না; চাকর উত্তর দিল, যে তোমাকে মসজিদের ভিতরে আসিতে দেয় না। সোব্‌হানাল্লাহ্! সোব্‌হানাল্লাহ্! চমৎকার উত্তর হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

বন্ধুগণ, খোদার তওফীক অস্বীকার করা যায় না। খোদা যাহাকে তওফীক দেন, সে-ই ধর্মের কাজ করিতে পারে। ইহা হইতে এবাদতকারীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এবাদত লইয়া গর্ব করা বা এবাদত বন্দেগী হইতে বঞ্চিত কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করা মোটেই সমীচীন নহে। কেননা, তুমি যাহা করিতেছ, তাহা একমাত্র খোদার তওফীকেই করিতেছ। ইহাকে নিজের বাহাদুরী মনে করিও না; বরং সর্বদা এই ভাবিয়া ভীত থাক যে, খোদা যেন অন্যান্যদের ন্যায় তোমার নিকট হইতেও তওফীক ছিনাইয়া না নেন।

মোটকথা, তওফীকের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করিলে হযরত হাজী সাহেব বর্ণিত এবাদত কবূল হওয়ার লক্ষণ সম্বন্ধে সমর্থন পাওয়া যায়। ইহাতে হক তা'আলার অপার অনুগ্রহেরও অনুমান করা যায়। আমরা যে নামায পড়ি তাহাতে না আছে খুশূ'-খুযূ' না আছে যিকর, না আছে ধ্যান। ঘড়ির কাঁটা যেমন আপনাআপনিই চলিতে থাকে, আমাদের নামাযও তদ্রূপ। নামাযের মধ্যে আমাদের মস্তিষ্কে রাজ্যের চিন্তা আসিয়া জড় হয়। কিন্তু উপরোক্ত লক্ষণানুযায়ী বুঝা যায় যে, আমাদের এইরূপ নামাযও কবূল হয়। এই রহমতের কোন পারাপার আছে কি?

তুমি কোন বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অন্য দিকে মনোনিবেশ করিয়া দেখ তো, তৎক্ষণাৎ দরবার হইতে বহিষ্কৃত হইবে। তাই মাওলানা বলেনঃ

ایں قبول ذکر تو از رحمت است ــ چوں نماز مستحاضہ رخصت است

চমৎকার উদাহরণ দিয়াছেন। মোস্তাহাযা মহিলার নামায যেমন একমাত্র রহমতের কারণেই কবূল হয়, আমাদের নামাযের অবস্থাও তদ্রূপ। মোস্তাহাযা মহিলা পাক-পবিত্র থাকে না—সর্বদা রক্ত ঝরিতে থাকে। তাসত্ত্বেও শরীঅত বলে—ক্ষতি নাই, নামায পড়িয়া যাও। কবূল হইয়া যাইবে।

খোদার এই রহমতের কথা জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাওয়া উচিত নয় যে, তিনি যখন সর্বাবস্থায়ই কবূল করেন, খুশূ'-খুযূ'র কি প্রয়োজন? না, প্রয়োজন আছে। কেননা, খুশূ'-খুযূ' ছাড়া নামায কবূল হওয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ। নিয়ম হইল—ওয়াজিব, শর্ত ইত্যাদি আদায় করিয়া নামায পড়িলেই কবূল হইবে—নতুবা নহে। কোন কোন আলেমের মতে নামাযে খুশূ'-খুযূ' ফরয। আবার কাহারও মতে ইহা সুন্নত। তবুও নিশ্চিত হওয়া কোন অবস্থাতেই সঙ্গত নহে। আত্মমর্যাদাশীল লোকগণ খোদার অপার অনুগ্রহ ও রহমতের কথা মনে করিয়া লজ্জায় মাথা হেট করিয়া দেয়। তাঁহারা ভাবেন—আফসোস! খোদার তরফ হইতে এত মনোনিবেশ, আর আমাদের তরফ হইতে এত উদাসীনতা! ছিঃ! ছিঃ! মরিয়া যাওয়ার কথা। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা এবাদতে আরও বেশী তৎপরতা অবলম্বন করেন।

ধর্ম-কার্যে অকৃতকার্যতার কারণঃ মোটকথা, বহু যুক্তির মাধ্যমে এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ধর্মের কাজ দুনিয়ার কাজ হইতে অনেক দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। উপরন্তু দুনিয়ার কাজে বিভিন্ন উপায়াদি অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞানীদের নিকট স্বীকৃত। এমতাবস্থায় ধর্মের কাজে উপায় অবলম্বন না করার কি যৌক্তিকতা থাকিতে পারে? কোন যৌক্তিকতা নাই।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, অকৃতকার্যতার কারণ কয়েকটি হইতে পারে—উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা কিংবা উদ্দেশ্য হাছিলের উপায় নির্দিষ্ট না হওয়া; কিংবা উপায় অত্যধিক কঠিন হওয়া অথবা উপায় দ্বারা মক্‌ছুদ হাছিল না হওয়া। যেক্ষেত্রে এই কয়েকটি কারণের মধ্য হইতে কোন

www.BANGLAKITAB.com

একটিও বিদ্যমান নাই, সেক্ষেত্রে অকৃতকার্যের কারণ সাহসের অভাব এবং অলসতা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাতে স্বতঃসিদ্ধভাবে বুঝা যায় যে, যাহারা ধর্মকাজে অকৃতকার্য হয়, তাহারা একমাত্র অলসতার কারণেই অকৃতকার্য হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অকৃতকার্যতার অন্য কোন কারণ নাই। কেননা, ধর্মকাজ যে একটি উদ্দেশ্য, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ইহার উপায়ও অজানা নহে। আমি জোর দাবীর সহিত এক্ষণেই বর্ণনা করিয়াছি যে, ধর্মের কাজে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই। কাজেই উপায় কঠিন হওয়ারও প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আয়াত ও হাদীসের সাহায্যে আমি ইহাও প্রমাণ করিয়াছি যে, দুনিয়ার কাজে উপায়াদি অবলম্বন করিলে মকছুদ হাছিল হওয়া নিশ্চিত নহে; কিন্তু ধর্ম কাজে উপায় অবলম্বন করিলে কামিয়াবী সুনিশ্চিত। কেননা, কোরআন ও হাদীসে এ সম্বন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ওয়াদা বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য খোদার তরফ হইতে উন্নতি এবং সাহায্য দানেরও ওয়াদা আছে। এর পরও কেহ ধর্ম-কাজে অকৃতকার্য হইলে উহার কারণ দুর্ভাগ্য ও অলসতা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

আয়াতের তফসীর ঃ প্রথমে আমি যে আয়াতখানি তেলাওয়াত করিয়াছি, উহাতে হক তা'আলা এই ধর্মীয় উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করিয়া তৎসঙ্গে উহার উপায়ও বর্ণনা করিয়াছেন। আমার বিস্তারিত বর্ণনা হইতে আপনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন যে, আয়াতে বর্ণিত উপায়টি অত্যধিক সহজ ও সরল। ইহা হইতে অধিক সহজ কোন উপায় হইতে পারে না। কিন্তু এই বিস্তারিত বর্ণনার পূর্বে আমি আয়াতের তফসীর করিয়া দেওয়া সমীচীন মনে করি। হক তা'আলা বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ*

এই আয়াতখানি দুই ভাগে বিভক্ত ঃ (১) اِتَّقُوا اللّٰهَ "তোমরা খোদাকে ভয় কর" (২) وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ "এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হইয়া যাও।"

ইহা কোরআন শরীফের অলৌকিক ক্ষমতা যে, এই দুইটি বাক্যের মধ্যে সমুদ্র ভরিয়া দিয়াছে। বিস্তারিত বর্ণনার পর বুঝিতে পারিবেন যে, এই দুইটি বাক্যের মধ্যে হক তা'আলা কত বিরাট বিষয়কে ব্যক্ত করিয়াছেন!

বিভিন্ন প্রকারে কোরআনের বাক্যাবলীর তফসীর হইতে পারে। কাজেই এই আয়াতে অন্য কোন তফসীরকার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু এই মতদ্বৈধতা কেবলমাত্র প্রকারভেদে সীমাবদ্ধ। আয়াতের মূল অর্থ একই থাকে। এই আয়াতের অর্থ আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা এই যে, اِتَّقُوا اللّٰهَ অংশে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ অংশে উহার উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

যাহারা গভীর মনোযোগ সহকারে কোরআন পাঠ করে; তাহারা ভালভাবেই জানে যে, কোরআনে হক তা'আলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের সঙ্গেসঙ্গে উহার উপায়ও বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার পরম অনুগ্রহ যে, তিনি কোন কাজের আদেশ দিয়া বান্দাকে হয়রান পেরেশান ছাড়িয়া দেন না; বরং কাজটি কি উপায়ে করিতে হইবে সঙ্গে সঙ্গে তাহাও বলিয়া দেন। হক তা'আলার এই অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমার রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা এই যে, এই আয়াতেও প্রথম বাক্যে উদ্দেশ্য ও দ্বিতীয় বাক্যে উহার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, "তাক্‌ওয়া" (খোদাভীতি) হইল উদ্দেশ্য এবং "সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়া" হইল উহা লাভ করিবার উপায়। অন্য কথায় বুঝিতে হইলে হক তা'আলা ধর্মকে পূর্ণরূপে অর্জন করার আদেশ দিয়াছেন এবং

www.BANGLAKITAB.com

কামেল ব্যক্তিদের সঙ্গলাভকে উহার উপায় হিসাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাকওয়ার তফসীর 'ধর্মে পূর্ণতা অর্জন' কিনা, তাহা আমি পরে বর্ণনা করিব। এক্ষণে আমি বলিতে চাই যে, ধর্মে পূর্ণ ধার্মিকতা উদ্দেশ্য ও কাম্য কিনা।

পূর্ণতা লাভের চেষ্টাঃ যাবতীয় উদ্দেশ্য অর্জনের বেলায় পূর্ণতা লাভই মানুষের লক্ষ্য থাকে। অপূর্ণ অবস্থায় কেহই সন্তুষ্ট থাকে না। ব্যবসা-বাণিজ্য করিলেও উহাতে পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করা হয়। দুই এক লক্ষ টাকা আমদানী হইলেই কেহ চেষ্টায় বিরত হয় না; বরং যতই উন্নতি হইতে থাকে, ততই আরও সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। প্রয়োজনের তুলনায় বেশী আমদানী হইয়াছে দেখিয়া কেহই ভবিষ্যতের জন্য চেষ্টা ত্যাগ করে না; বরং আরও নানা রকম নূতন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেয়। যদি কাহারও সাধারণ গৃহ সরঞ্জামের দোকান থাকে এবং উহা হইতে প্রচুর আমদানী হয়, তবে পুঁজি বৃদ্ধি হওয়ার পর সে একটি কাপড়ের দোকানও খুলিয়া বসে। ইহাতে উন্নতি হইলে জুতার ব্যবসাও আরম্ভ করিয়া দেয়। এমন কি প্রথমে পিতা-পুত্র সকলেই এক দোকানের কাজ করিলে পরে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক দোকান খোলা হয়। আমরা এসব দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করি। এর পর বহু বাসা ক্রয় করিয়া ভাড়া দেওয়া হয়। মোটকথা, উন্নতির জন্য চিন্তার বিরাম নাই। কোন পর্যায়েই ক্ষান্ত হয় না। কথায় বলেঃ لَايَنْتَهِىْ اِرْبٌ اِلَّا اِلٰى اِرْبٍ "এক প্রয়োজন সমাপ্ত হইতে না হইতেই অপর প্রয়োজন দেখা দেয়।"

কাহারও নিকট প্রয়োজন মাফিক জায়গা-জমি থাকিলেও সে উহাতে তৃপ্ত হয় না; বরং কিরূপে সারা গ্রাম ক্রয় করা যায়, সে সেই চিন্তায়ই মশগুল থাকে। এক গ্রাম ক্রয় করার পর অন্য গ্রাম ক্রয় করার আশা মনের কোণে বাসা বাঁধিয়া বসে।

هفت اقليم ار بگيرد پادشاه ــ همچناں در بند اقليمے دگر

(হাফ্ত একলীম আর বগীরাদ পাদশাহ্+ হামচুনাঁ দর বন্দে একলীমে দিগার)

"বাদশাহ্ যদি সপ্ত-রাজ্যও হাছিল করে, তবুও সে আরও অধিক রাজ্য লাভের আশায় থাকে।"

মোটকথা, পার্থিব উন্নতির বেলায় মানুষ সর্বদাই বেশীর কামনা করে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার এই কামনা শেষ হয় না। শেখ সা'দী বলেনঃ

گفت چشم تنگ دنيادار را ــ يا قناعت پر كند يا خاك گور

(গোফ্ত চশ্‌মে তঙ্গ দুনিয়াদার রা + ইয়া কানাআত পুর কুনাদ ইয়া খাকে গোর)

"বলিয়া দাও সংকীর্ণ-চক্ষু দুনিয়াদারের কানাআত কিংবা কবরের মাটিই তাহার লোভ পরিপূর্ণ করিতে পারে।" দুনিয়াদারের কোন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, তবে হাঁ, কবরের মাটিতেই তাহার লোভের পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারে।

হয়তো আপনি এমন কোন ব্যক্তি দেখাইতে পারিবেন, যে দশ হাজার টাকা কিংবা দশটি গ্রাম লাভ করার পর ভবিষ্যতের জন্য চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছে। প্রথমতঃ, এরূপ ব্যক্তি খুবই বিরল। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এক আধজন এরূপ হইলে তাহা না হওয়ারই শামিল। কাজেই ইহাতে আমার বর্ণিত নীতিতে কোনরূপ ত্রুটি লাগিতে পারে না। কেননা, অধিকাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নীতি নির্ধারিত হয়। অধিকাংশ লোকের অবস্থা আমার বর্ণিত নীতির সম্পূর্ণ অনুকূলে। দ্বিতীয়তঃ, আমি বলিব যে, আপনি যাহাকে এরূপ দেখাইবেন, সে দ্বীনদার হইবে—দুনিয়াদার হইবে না। আর

www.BANGLAKITAB.com

আমি তো দুনিয়াদারদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। যদি এই ব্যক্তি দ্বীনদার না হয়, তবে ইহার মোটামুটি উত্তর এই যে, এই পরিমাণ দৌলত অর্জন করাই তাহার মতে পূর্ণতা। এই পূর্ণতা লাভ হইয়া যাওয়ার পর তাহার দৃষ্টিতে আর কোন পূর্ণতা নাই। সুতরাং বুঝা গেল যে, সে-ও পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষী, সে-ও অপূর্ণ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে নাই।

আসল উত্তর এই যে, সে বাহ্যিক উন্নতি শেষ করিয়া দিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এখনও উন্নতি করিতেছে। কারণ, সে জ্ঞানী দুনিয়াদার—অজ্ঞান নহে। সে দুনিয়ার প্রাণ বুঝিয়া ফেলিয়াছে যে, জীবিকা উপার্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল মানসিক শান্তি লাভ করা। সর্বদাই জীবিকার পিছনে লাগিয়া থাকিলে মানসিক শান্তি ব্যাহত হয়। মন অস্থির থাকে। এই কারণে যথেষ্ট পরিমাণ ধন অর্জন করার পর সে ভবিষ্যতের জন্য বাহ্যিক উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে এখনও উন্নতি করিতেছে। অর্থাৎ, সে আরাম ও মানসিক শান্তি বৃদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছে।

মোটকথা, প্রমাণিত হইল যে, পার্থিব উপায়াদির বেলায় মানুষ সর্বদাই পূর্ণতা অন্বেষণ করে। কোন লভ্য বস্তুর উপর চেষ্টা শেষ করে না। কেহ কোন নির্দিষ্ট সীমায় চেষ্টা শেষ করিলেও তাহা অপূর্ণ অবস্থায় করে না; বরং চেষ্টাকে উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাইয়াই ক্ষান্ত হয়। উদাহরণতঃ কাহারও ব্যবসায় ক্ষতি হইতে থাকিলে সে তদবস্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া যায় না; বরং সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়, এরূপ সম্পদ সঞ্চিত করিয়াই চেষ্টা ত্যাগ করে। সুতরাং নিশ্চিতরূপেই জানা গেল যে, অপূর্ণ অবস্থায় কাহারও তৃপ্তি হয় না; বরং পূর্ণতা লাভের পরেই হয়। এই তৃপ্তিও বাহ্যত হইয়া থাকে, নতুবা প্রকৃতপক্ষে তাহার উন্নতি তখনও শেষ হয় না।

দ্বীনদারী ও অল্পে তুষ্টিঃ আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ ধর্ম-কার্যে অপূর্ণ অবস্থায়ই তুষ্ট হইয়া যায়। পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়িয়া লওয়াকেই আজকাল বড় দ্বীনদারী মনে করা হয়। নামায পড়া আরম্ভ করার পর হইতেই নিজকে দ্বীনদার মনে করে এবং ইহাকেই যথেষ্ট মনে করিয়া লয়। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, তাহাদের নামাযও সবদিক দিয়া সম্পূর্ণ নহে। অথচ নামায পূর্ণভাবে আদায় করিলেও দ্বীনদারী কামেল হয় না। সুতরাং নামাযই যেখানে অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ, সে ক্ষেত্রে ইহারই উপর সন্তুষ্ট হইয়া যাওয়া খুবই দোষের কথা। কেহ নামাযের সাথে সাথে যদি যাকাতও আদায় করে, তবে আর কি, মনে করে যে, বস্ জান্নাত কিনিয়া ফেলিলাম। এর পর হজ্জ করিলে তো আর কথাই নাই, যেন জুনাইদ বাগদাদী হইয়া গেল। এর পর সম্মুখে আর উন্নতি করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করে না। ইহাতেই দ্বীনদারী কামেল হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া সে চেষ্টাচরিত্র একেবারে বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। সর্বসাধারণের কথা কি বলিব, কিছু সংখ্যক আলেমকেও এই রোগে আক্রান্ত দেখা যায়।

একবার জনৈক আলেম আমার নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন—আপনার বর্ণিত ওযীফা ইত্যাদি পড়িয়া শেষ করিয়াছি। এখন সম্মুখে আরও কোন সবক আছে, না এই পর্যন্তই শেষ? আফসোস! মরা দুনিয়ার জন্য চেষ্টা করিতে যাইয়া মানুষ কোথাও সন্তুষ্ট হয় না, আর দ্বীনদারী কি এতই হেয় হইয়া গেল যে, দুই চারি দিন কাজ করিয়াই মানুষ নিজকে কামেল মনে করিতে থাকে। এই আলেমের পত্র পাঠ করিয়া আমি যারপরনাই বিরক্তি অনুভব করিলাম। মনে হইল যে, সে দ্বীনের আদব মোটেই জানে না। তাহার ব্যবহৃত শব্দ হইতে পরিহাস ফুটিতেছিল। আমি উত্তরে লিখিয়া দিলাম, আপনার সহিত আমার বনিবনাও হইবে না। আপনাকে আমি সম্বোধনের

www.BANGLAKITAB.com

উপযুক্ত মনে করি না। আপনি দ্বীনদারী তো হাছিল করিতে চানই না—অন্তরে উহার প্রতি শ্রদ্ধাও রাখেন না। (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

মোটকথা, মানুষের ধারণা যে, দ্বীনদারী শুধু নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বেশী কোনকিছু করার প্রয়োজন নাই। উপরন্তু কেহ পুরাপুরি তাকওয়া অবলম্বন করিলে, বান্দার হকের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে এবং দ্বীনদারীতে উন্নতি করিতে চাহিলে তাহাকে পাগল মনে করা হয়। কিন্তু সে এমন পাগল যাহার সম্বন্ধে মাওলানা বলিয়াছেনঃ

او گل سرخ ست تو خونش مخـوان – مست عقل ست او تو مجنونش مدان

(উ গোলে সুরখ আস্ত তূ খুনাশ মখাঁ + মস্তে আক্বল আস্ত উ তূ মজনূনাশ মদাঁ)

"তিনি লাল ফুল, তাঁহাকে তুমি রক্ত মনে করিও না। তিনি সজ্ঞান বিভোর, তাঁহাকে পাগল মনে করিও না।" তাহারা তো খোদার পাগল।

ما اگـر قلاش و اگـر ديـوانه ايم – مست آں ساقی و آں پيمـانه ايم

(মা আগর কাল্লাশ ও আগর দেওয়ানায়েম + মস্ত আঁ সাকী ও আঁ পায়মানায়েম)

"আমরা যদি নিঃস্ব ও পাগল হইয়া থাকি, তবে তাহা আল্লাহ্র জন্যই।" এই পাগলামী তো তাহাদের জন্য গর্বের বিষয়।

اوست ديـوانـه كه ديـوانـه نشـد – مرعسس را ديـد و در خانه نشد

(উস্ত দিওয়ানা কেহ্ দিওয়ানা নাশুদ + মার্‌আসাস রা দীদ ও দর খানা নাশুদ)

"যে পাগল হয় নাই, সে-ই পাগল। কেননা, সে কোতয়ালকে দেখিয়াই ঘরে প্রবেশ করিল না।"

জনৈক খোদা-প্রেমিকের কাহিনীঃ আমার জনৈক বন্ধু প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পরে তিনি দ্বীনদারীর হেফাযতের খাতিরে স্বেচ্ছায় শাসন বিভাগ হইতে বদলী হইয়া বর্তমানে শিক্ষা বিভাগে কাজ করিতেছেন। এই চাকুরীতে তিনি পূর্বাপেক্ষা কম বেতন পাইতেছেন। এই কারণে অনেকে তাঁহাকে বোকা বানাইয়া বলিতে শুরু করিয়াছে—অদ্ভুত পাগল আর কি! এত বড় বেতনের চাকুরী ত্যাগ করিয়া অল্প বেতনে সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং শাসন বিভাগের চাকুরী ছাড়িয়া নিকৃষ্ট চাকুরী গ্রহণ করিয়াছে। আমি বলি, তাহারা যখন খোদার সম্মুখে পৌঁছিবে, তখন বুঝিতে পারিবে আসলে কে বোকা।

তিনি একবার রেলভ্রমণে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ছেলেও ছিল। তিনি ছেলের সঠিক বয়স অনুসন্ধান করিতেছিলেন যে, বার বৎসর পূর্ণ হইয়াছে কিনা। বার বৎসর পূর্ণ হইলে রেলওয়ের আইনানুযায়ী তাহার জন্যও পূর্ণ টিকেট লইতে হইবে। তাঁহার সঙ্গীয় লোকগণ বলিলেন, ছেলের বয়স কিছুতেই বার বৎসর হইবে না। হইলেও আকৃতিতে সে দশ বৎসরেরই মনে হয়। সুতরাং তাহার জন্য পূর্ণ টিকেট না লইলেও কেহ কিছু বলিবে না। বন্ধুবর বলিলেন, রেল কর্মচারীরা কিছু না বলিলেও খোদা তো নিশ্চয়ই বলিবেন যে, তুমি অন্যের জিনিস অনুমতি না লইয়া ও ভাড়া আদায় না করিয়া কেন ব্যবহার করিলে? মোটকথা, তিনি ছেলের বয়স খোঁজাখুঁজি করিতেছিলেন, এদিকে তাঁহার চাকর তাহাতে হাসিতেছিল। অবশেষে জানা গেল যে, ছেলের বয়স বার বৎসর হইতেও কিছু বেশী। ফলে তিনি তাহার জন্যও পূর্ণ টিকেট লইলেন।

www.BANGLAKITAB.com

ইহা দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে এইরূপ পরামর্শ দিতে ত্রুটি করিল না যে, সাহেব—আপনার কাছে টাকা বেশী হইয়া থাকিলে কোন দরিদ্রকে দান করিয়া দিন। রেলওয়েকে কেন দিতেছেন? কেননা, রেল কর্মচারীরা এই ছেলের জন্য পূর্ণ টিকেট চাহিতেই পারে না। তিনি উত্তরে বলিলেন, যে উদ্দেশ্যের জন্য আমি এইরূপ খোঁজাখুঁজি করিতেছি, দরিদ্রকে টাকা দান করিলে তাহা লাভ হইবে না। অর্থাৎ, দরিদ্রকে টাকা দান করিলেই অপরের স্বত্ব বিনানুমতিতে ব্যবহার করা জায়েয হইয়া যাইবে না। মোটকথা, এ ব্যাপারে সকলেই তাহাকে বোকা ও পাগল ঠাওরাইতেছিল; কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন খোদার পাগল।

নীতি হইল, যখন দ্বীনদারী প্রবল হয়, তখন মুসলমান পার্থিব ক্ষয়ক্ষতির প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। তবে কোথায় পার্থিব ক্ষতি বরদাশ্‌ত করা এবং কোথায় না করা,—তাহা বিচক্ষণ বুযুর্গদের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া আবশ্যক। ব্যাপকভাবে যে কোন পার্থিব ক্ষয়ক্ষতির বরদাশ্‌ত করা জরুরী নহে; বরং বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। মোটামুটিভাবে শরীঅতের কোন ওয়াজিব কাজ পালন করিতে কিংবা কোন হারাম কাজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া যদি অর্থ কিংবা আত্মসম্মানের ক্ষতিও হয়, তবে তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নহে। আর যদি প্রাণ নাশের আশঙ্কাজনিত ক্ষতি দেখা দেয়, তবে এই ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব কাজ ওয়াজিব থাকিবে না এবং হারাম কাজ হারাম থাকিবে না। মোস্তাহাব কিংবা সুন্নত পালন করিতে যাইয়া আর্থিক ক্ষতি বরদাশ্‌ত করা ওয়াজিব নহে; বরং তাহা উত্তম এবং দৃঢ়তা বলিয়া বিবেচিত হইবে। কখনও কখনও মোস্তাহাব ও সুন্নতের জন্য প্রাণনাশ জনিত ক্ষতি সহ্য করা না-জায়েয ও হারাম বলিয়া গণ্য হয়। উহা জানিতে হইলে ফেকাহ্‌র কিতাবাদি পাঠ করা আবশ্যক। ক্ষতি সহ্য করা কোথায় উচিত, কোথায় অনুচিত এবং কোথায় ওয়াজিব, কোথায় হারাম—তাহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারে না।

মূর্খ তাওয়াক্কুল (ভরসা) কারীর কাহিনী ঃ এই বিষয়টি প্রত্যেকের নিজস্ব মতামতের উপর ছাড়িয়া দিলে তাহা নিম্নোদ্ধৃত কাহিনীর ন্যায় হইবে।

জনৈক ব্যক্তি তাওয়াক্কুলের ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক মৌলবী সাহেবের ওয়ায শুনিয়াছিল। সে এই ভাবিয়া খুব আনন্দিত হইল যে, খোদা যখন এমনিতেই রুযী পৌঁছাইতে পারেন, তখন এত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ও পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? সেমতে সে যাবতীয় কাজ-কারবার ছাড়িয়া দিয়া সড়কের ধারে বসিয়া রহিল। সড়ক হইতে একটু দূরে যাইয়া বসিবে এ সাহসও হইল না। সে ভাবিল যে, সড়কের ধারে বসিলে পথিকগণ তাহাকে দেখিতে পাইবে। তাছাড়া সেখানে একটি কূপও ছিল। উহার নিকটে বসিয়া প্রায়ই পথিকগণ খাওয়া-দাওয়া করিত। পথিকদের মধ্য হইতে কেহ না কেহ তাহাকে খাইতে দিবেই। এই ভাবিয়াও সে উক্ত জায়গাটি পছন্দ করিল। কিছুক্ষণ পর জনৈক পথিক আসিয়া সেখানে খাওয়া-দাওয়া করিল এবং আপন পথে চলিয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল, এবার যে আসিবে, সে নিশ্চয়ই আমাকে খাইতে দিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিল; কিন্তু হায়, সে-ও তাহার দিকে পিঠ দিয়া খানা খাইয়া চলিয়া গেল। এইভাবে দুই তিনদিন অতিবাহিত হইয়া গেল, কেহ তাহাকে এক লোকমাও খাইতে দিল না। সর্বশেষে জনৈক পথিক আসিয়া খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত করত চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেই সে গলাঝাড়া দিয়া উহ্, আহ্ শুরু করিয়া দিল। পথিক নিকটে আসিয়া দেখিল যে, লোকটি ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। সঙ্গে যে কয়টি রুটি অবিশিষ্ট ছিল, সমস্তই তাহার সম্মুখে দিয়া দিল। রুটি খাইয়া সাহেবের চৈতন্য পুনর্বহাল হইল।

www.BANGLAKITAB.com

অতঃপর সে দৌড়িয়া মৌলবী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, জনাব, আপনি তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে ওয়ায করিতে যাইয়া একটি বিশেষ জরুরী কথা ছাড়িয়া দিয়াছেন। উহা না বলায় খোদা জানে কত মানুষ কষ্ট ভোগ করিতেছে। খোদার কৃপায় আমি নিজস্ব চেষ্টায় বিষয়টি বুঝিতে পারিয়াছি। নতুবা আমিও প্রাণ হারাইতাম। ভবিষ্যতে আপনি যখনই তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে ওয়ায করিবেন, তখন মেহেরবানীপূর্বক এই কথাটিও বলিয়া দিবেন যে, গলা ঝাড়া দেওয়ারও প্রয়োজন আছে। এর পর লোকটি মৌলবী সাহেবকে আপন কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনাইল।

দেখুন, এই ব্যক্তি জীবিকার উপায়াদি ত্যাগ করার কথা শুনিয়া মনে করিল যে, সে-ও এই কাজের যোগ্য। ফলে কাজ-কারবার হইতে হাত গুটাইয়া অহেতুক কষ্ট ভোগ করিল। তাহার উচিত ছিল, আধ্যাত্মিক চিকিৎসকের নিকট জিজ্ঞাসা করা যে, সে চেষ্টা-চরিত্র ত্যাগ করার যোগ্য কিনা।

জনৈক ব্যক্তি ওয়ায শুনিয়াছিল যে, খোদার পথে এক টাকা দান করিলে উহার পরিবর্তে দুনিয়াতে দশ ও আখেরাতে সত্তর টাকা পাওয়া যায়। সে মনে মনে ভাবিল, এর চেয়ে উত্তম ব্যবসা আর কি হইবে? সবকিছু ছাড়িয়া ইহাই করা উচিত। তাহার নিকট একটি টাকা ছিল। সে তৎক্ষণাৎ উহা খয়রাত করিয়া দিল এবং দশ টাকা পাওয়ার আশায় প্রহর গণিত লাগিল। কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গেল; কিন্তু একটি পয়সাও আসিল না। সে খুব অস্থির হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পর পর তাহার কেবল টাকাটির কথা মনে জাগিত। সে মনে মনে মৌলবী সাহেবকেও মন্দ বলিত। এইরূপে ক্রমাগত চিন্তার ফলে তাহার দাস্ত ও আমাশয় দেখা দিল। সে ঘন ঘন জঙ্গলে যাতায়াত করিতে লাগিল।

একবার সে পায়খানায় বসিয়া মাটি খুড়িতেছিল। হঠাৎ মাটির নীচ হইতে একটি থলিয়া বাহির হইয়া আসিল। উহাতে পূর্ণ দশ টাকা রক্ষিত ছিল। সে যারপরনাই আনন্দিত হইল। দাস্তও বন্ধ হইয়া গেল। কারণ, যে কারণে দাস্ত হইতেছিল, তাহাই আর বাকী ছিল না। সে দৌড়িয়া মৌলবী সাহেবের নিকট যাইয়া বলিতে লাগিল, জনাব, আপনার ওয়ায ষোল আনা সত্য। তবে কিনা উহাতে একটি কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে কোথাও এই মাসআলাটি বর্ণনা করিলে ইহাও বলিয়া দিবেন যে, আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়া শরীরও মোচড়াইতে হয়। এর পর যে ইহা সহ্য করিতে পারিবে, সে এক টাকার পরিবর্তে দশ টাকা পাইবে। আর যে সহ্য করিতে পারিবে না, সে এই পথেই আসিবে না। একের পরিবর্তে দশ পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু মোচড় সহ্য করিতে সাংঘাতিক কষ্ট হয়।

মোটকথা, প্রত্যেককেই ক্ষতি সহ্য করার অনুমতি দেওয়া যায় না। তজ্জন্য কিছু শর্ত ও যোগ্য পাত্রের প্রয়োজন। তবে ইহাও সত্য যে, দ্বীনদারী প্রবল হইয়া গেলে দ্বীনদার ব্যক্তি পার্থিব ক্ষতির পরওয়া করে না।

জনৈক খোদা-প্রেমিকের কাহিনী ঃ আমার জনৈক বি,এ, পাশ বন্ধু একবার রেলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট যথেষ্ট আসবাব-পত্র ছিল। ঘটনাক্রমে যে ষ্টেশনে তিনি গাড়ীতে চড়িয়াছিলেন, সময়ের অভাবে তথায় আসবাবপত্র ওযন ও বুক করাইতে পারেন নাই। অগত্যা তিনি ভাবিলেন যে, যে ষ্টেশনে নামিব, সেখানে আসবাবপত্র ওযন করাইয়া রেলওয়ের ভাড়া পরিশোধ করিয়া দিব। সেমতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া তিনি কর্মরত বাবুকে বলিলেন, আমার নিকট বেশী মালপত্র আছে, কিন্তু সময়ের অভাবে উহা ওযন করাইয়া বুক করাইতে পারি নাই। এখন

www.BANGLAKITAB.com

আপনি মালপত্রগুলি ওযন করিয়া ভাড়া গ্রহণ করুন। যেহেতু আমি স্বেচ্ছায় বলিয়া দিয়াছি, কাজেই আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি খিয়ানত অথবা আইনকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করি নাই। অতএব, আইনত যাহা ভাড়া হয়, আমার নিকট হইতে তাহাই লওয়া উচিত—ডবল চার্জ করা উচিত নহে। বাবু বলিল, স্বচ্ছন্দে চলিয়া যান, আপনার নিকট হইতে কিছুই লইব না। বন্ধুবর আবার পীড়াপীড়ি করিলেন। বাবু বিস্ময় সহকারে তাঁহাকে ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট লইয়া গেল। ষ্টেশন-মাষ্টারও ভাড়া নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি এখানেও পীড়াপীড়ি করিলেন। তাহাদের ধারণা ছিল যে, আগন্তুক লোকটি ইংরেজী ভাষা জানে না। তাই তাহারা উভয়ে ইংরেজীতে আলাপ করিতে লাগিল। তাহাদের আলাপের সারমর্ম ছিল এইরূপঃ মনে হয়, লোকটি মদ পান করিয়াছে। তাই লইতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় টাকা দিতে চাহিতেছে। বন্ধুবর বলিলেন, আমি মদ পান করি নাই, তবে আমার ধর্ম আমাকে এরূপ করিতে বাধ্য করিতেছে।

আফ্‌সোস্ আজকাল প্রবঞ্চনা ও চাতুরীর বাজার গরম হইয়া গিয়াছে। ফলে কেহ স্বেচ্ছায় খোদার ভয়ে অন্যের হক আদায় করিতে পারে বলিয়া মানুষ বিশ্বাসই করে না। তাহাদের মতে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্যের হক আদায় না করে, সে-ই বুদ্ধিমান। আর যে ইহা আদায়ের জন্য ব্যস্ত থাকে, তাহাকে পাগল মনে করা হয়। রেলওয়ে কর্মচারীরা বন্ধুবরকেও পাগল মনে করিয়া বলিয়া দিল—আপনি আসবাবপত্র লইয়া চলিয়া যান। আমরা অনুমতি দিলাম, কেহ কিছু বলিবে না। তিনি বলিলেন, আপনাদের এরূপ অনুমতি দেওয়ার কোন অধিকার নাই। আপনারা কোম্পানীর মালিক নহেন—কর্মচারী মাত্র। কাজেই রেলওয়ের প্রাপ্য মাফ করিবার আপনাদের কি অধিকার আছে? শেষ পর্যন্ত কোনক্রমেই তাহারা মালের ভাড়া লইল না। তিনি আসবাবপত্র উঠাইয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হে খোদা! এখন আমি কি করিব? তখন হক তা'আলা তাহাকে সাহায্য করিলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার বান্দা গোনাহ্ হইতে বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। অন্যেরা তাহাকে গোনাহে লিপ্ত করিতে চায়, সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ বন্ধুবরের অন্তরে এই ধারণা জাগ্রত হইল যে, মালের ভাড়ার টাকা দ্বারা রেলওয়ে হইতে একটি টিকেট কিনিয়া ছিড়িয়া ফেলা উচিত। এইভাবে ভাড়া আদায় হইয়া যাইবে। অনন্তর তিনি তাহাই করিলেন।

বন্ধুগণ, আপনারা ধর্মের উপর আমল করিয়া দেখুন। ইন্‌শাআল্লাহ্ পদে পদে খোদার সাহায্য স্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন।

খোদার সাহায্যঃ ইহা জানা কথা যে, খোদার সাহায্য ব্যতীত দ্বীনদারীতে পূর্ণতা অর্জন করা যায় না। আমি জোর দাবীর সহিত বলিতে পারি যে, প্রাথমিক পর্যায়ে হক্ তা'আলা পুরাপুরি সাহায্য করেন। কাজেই ধর্মের কাজে যখন শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত খোদার সাহায্য বিদ্যমান, তখন ভয়ের কোন কারণ নাই। অনেকেই বলে, ধর্মের উপর আমল করিব কিরূপে? ইহা যে খুব কঠিন। আমি বলি, যদি আপনার কাছে কঠিন হয়, তবে খোদার কাছে কিছুতেই কঠিন নহে। তিনি যখন সাহায্যের ওয়াদা করেন, তখন এই ওযর পেশ করা নফ্‌সের দুষ্টামি বৈ কিছুই নহে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ○

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ, "যাহারা আমার পথে চলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, আমি তাহাদিগকে আমার পথ দেখাইয়া দেই এবং যে ব্যক্তি খোদাকে ভয় করে, খোদা তাহার জন্য নিষ্কৃতির পথ বাহির করিয়া দেন।"

চিন্তাহীনতা ঃ পরিতাপের বিষয়, এর পরও মানুষ দ্বীনদারীতে উন্নতি করিতে চেষ্টিত হয় না। যাহার মধ্যে যতটুকু দ্বীনদারী আছে, সে উহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। আমি শুধু সাধারণ লোকের কথাই বলিতেছি না; বরং দুঃখের বিষয়, বিশিষ্ট লোকগণও উন্নতির চিন্তা করে না। যাহারা শিক্ষাদান কার্যে রত আছে, তাহারা উহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া মনে করে যে, বড় দ্বীনদার হইয়া গিয়াছে, সর্বদা খোদার কালাম ও রাসূলের বাণী লইয়া গবেষণা করিতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাহাই যদি হইত, তবে শরীঅতে লেন-দেন ও সামাজিকতার শিক্ষা কেন রহিয়াছে? চরিত্র সংশোধনের প্রতি জোর দেওয়া হইয়াছে কেন? এইগুলি দ্বীনদারীর অন্তর্ভুক্ত নহে কি? এইগুলির উপর আমল করার জন্য মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া অন্য জাতি পয়দা হইবে কি? ফেকাহ্ শাস্ত্রে তাকওয়া সম্বন্ধে বহু খুঁটিনাটি মাসআলা বর্ণিত হইয়াছে। তোমরা সেগুলির উপর আমল কর না কেন? ফেকাহ্বিদগণ এই সমস্ত মাসআলা কেন বর্ণনা করিয়াছেন?

দুনিয়াদার ব্যক্তি সামান্য দ্বীনদারী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, আলেমগণ অল্প দ্বীনদারী লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া গেলে তদপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কারণ, দ্বীনদারী অল্প হইলেও দুনিয়াদাররা দুনিয়ার আরাম ও শান্তি লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে মৌলবী সাহেবরা দুনিয়ার ব্যাপারে তো রিক্তহস্ত থাকেনই; তদুপরি যদি দ্বীনদারীতেও রিক্তহস্ত হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের কোন দিক লাভ হইল না। দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় ক্ষেত্রেই অশান্তি। দুনিয়াতে তাঁহাদের অশান্তি লাগিয়াই আছে। বসবাসের জন্য না আছে সুউচ্চ দালান-কোঠা, চাকর-বাকর এবং না আছে টাকা-পয়সা ও সুস্বাদু আহার্য। রেশমী পোশাকও তাঁহারা পরিধান করিতে পারেন না। এমতাবস্থায় এই সম্প্রদায়টি সামান্য দ্বীনদারী লইয়াই কেন যে সন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং দুনিয়া ত্যাগের পরও দ্বীনদারীতে পূর্ণতা অর্জন করে না, তাহা বাস্তবিকই দুর্বোধ্য। ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন ঃ

اَرَى الْمُلُوْكَ بِاَدْنَى الدِّيْنِ قَدْ قَنَعُوْا ـ وَمَا اَرَاهُمْ رَضُوْا فِى الْعَيْشِ بِالدُّوْنِ
فَاسْتَغْنِ بِالدِّيْنِ عَنْ دُنْيَا الْمُلُوْكِ ـ كَمَا اسْتَغْنَى الْمُلُوْكُ بِدُنْيَاهُمْ عَنِ الدِّيْنِ

"রাজা বাদশাহ্দিগকে দেখি, তাহারা সামান্য দ্বীনদারীতে সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সামান্য দুনিয়া লইয়া সন্তুষ্ট হইতে তাহাদিগকে কখনও দেখা যায় না। অতএব, তুমি দ্বীনদারী লইয়া তাহাদের দুনিয়াদারী হইতে বিমুখ হইয়া যাও—যেমন, তাহারা দুনিয়াদারী লইয়া দ্বীনদারী হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে।" অর্থাৎ, দুনিয়ার ব্যাপারে রাজা-বাদশাহ্দিগকে পিছনে ফেলা সম্ভব না হইলেও দ্বীনের ব্যাপারে তাহাদিগকে পিছনে ফেলা যায়; সুতরাং তুমি তাহাই কর। অদ্য তাহাদের তোমা অপেক্ষা বেশী অগ্রসর দেখা যায় সত্য; কিন্তু কাল দ্বীনদারীতে তুমি তাহাদের অপেক্ষা অগ্রসর থাকিবে। পক্ষান্তরে যদি তুমি দ্বীনদারীতেও পিছনে পড়িয়া থাক, তবে তাহারা সর্বক্ষেত্রেই তোমা হইতে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ইহা মারাত্মক ক্ষতির কথা। সোবহানাল্লাহ্! কি চমৎকার শিক্ষা! ঠিক এইরূপ অর্থেই অপর একজন কবি বলিয়াছেন ঃ

www.BANGLAKITAB.com

یاد داری که وقت زادن تو ـ همه خندان بدند و تو گریان
آنچنان زی که وقت مردن تو ـ همه گریان شوند و تو خندان

(ইয়াদ দারী কেহ্ ওয়াক্‌ত যাদানে তু + হামা খান্দাঁ বুদান্দ ও তু গিরয়াঁ
আঁচুনা যী কেহ ওয়াক্‌ত মুর্দানে তু + হামা গিরয়াঁ শাওয়ান্দ ও তু খান্দাঁ)

"স্মরণ আছে কি? তোমার জন্মগ্রহণের সময় সকলেই হাসিতেছিল আর তুমি কাঁদিতেছিলে। এখন তুমি এইভাবে জীবনযাপন কর যেন তোমার মৃত্যুতে সকলেই কাঁদে আর তুমি হাসিতে থাক।"

একটি চমৎকার বিষয়বস্তু ঃ অর্থাৎ, তোমার স্মরণ আছে কি? যখন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, তখন সকলেই হাসিতেছিল; কিন্তু তুমি কাঁদিতেছিলে। তাহারা যালেমই বটে। কারণ, তোমার ক্রন্দনেও তাহাদের দয়া হয় নাই। তাহারা তখনও হাসিতেছিল। এখন তুমি ইহার প্রতিশোধ এইভাবে লও যে, তোমার মৃত্যুর সময় তাহারা যেন কাঁদে এবং তুমি হাসিতে থাক। অর্থাৎ, এইভাবে জীবনযাপন কর—যাহাতে তোমার মৃত্যুতে সকলেই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ে এবং তুমি খোদার সহিত মোলাকাতের কথা ভাবিয়া আনন্দিত হও। তাহারা কাঁদিতে থাকিবে আর তুমি হাসিতে থাকিবে। এমন যেন না হয় যে, মৃত্যুর সময়ও সকলেই আপদ দূর হইল ভাবিয়া আনন্দিত হয় এবং তুমিও কৃত গোনাহ্‌সমূহের জন্য কাঁদিতে থাক। পূর্বোল্লিখিত কবিতার ন্যায় এই কবিতার মধ্যেও তুলনামূলক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, তোমার কান্না দেখিয়া যেরূপ সকলেই হাসিতেছিল, এখন তুমিও তদ্রূপ তাহাদের কান্না দেখিয়া হাসিতে হাসিতে দুনিয়া ত্যাগ কর এবং আখেরাতের আরাম-আয়েশ দেখিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিতে থাক ঃ

يَالَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ ○ بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ*

'হাঁ আমার কওম যদি জানিত যে, খোদা আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের তালিকাভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।' তাহারা ইহা জানিতে পারিলে কাঁদাকাটি ত্যাগ করিয়া দিত। পূর্বোল্লিখিত কবিতায়ও এইরূপ তুলনামূলক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, দ্বীনদারীতে রাজা-বাদশাহ্‌দিগকে পিছনে ফেলিয়া দাও—যেমন তাহারা তোমাদিগকে দুনিয়াদারীতে পিছনে ফেলিয়া দিয়াছে। আজকালকার রাজা বাদশাহ্‌রা হযরত ছাহাবীদের ন্যায় নয় যে, তাহাদিগকে পিছনে ফেলা কঠিন হইবে।

ছাহাবীদের অবস্থা ঃ ছাহাবা (রাঃ)-এর অবস্থা ছিল এইরূপ ঃ একদা দরিদ্র মুসলমানগণ হুযূর (দঃ)-এর খেদমতে অভিযোগ পেশ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ধনীরা আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। আমরা যেমন নামায রোযা যিকর ইত্যাদি করি, তাহারাও তদ্রূপ করে। অধিকন্তু তাহারা যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে এবং জেহাদে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে। আমরা এগুলি করিতে পারি না। ইহার উত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন ঃ তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর— سُبْحَانَ اللهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ এই ওযীফা রীতিমত পাঠ কর। ইহাতে তোমরা ধনীদের ছদ্‌কা-খয়রাত হইতেও বেশী সওয়াব পাইবে। ধনী ছাহাবীগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহারাও এই ওযীফা পাঠ করিতে লাগিলেন। গরীবরা আবার হুযূর (দঃ) -এর খেদমতে অভিযোগ লইয়া হাযির হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদিগকে যে ওযীফা

www.BANGLAKITAB.com

শিখাইয়াছিলেন, ধনীরাও তাহা পাঠ করিতে শুরু করিয়াছে। তিনি উত্তরে বলিলেন, এখন আমি কি করিব? খোদার অনুগ্রহের দরজা তাহাদের সম্মুখে আমি কিরূপে বন্ধ করিয়া দিব: ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ 'ইহা খোদার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান করেন।

মালদার ছাহাবাগণ সর্বদাই দ্বীনদারীর উন্নতির পিছনে লাগিয়া থাকিতেন। তাঁহারা যখনই কোন নেক কাজের সংবাদ অবগত হইতেন, সকলের আগে উহা করার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদিগকে দ্বীনদারীতে পিছনে ফেলিয়া দেওয়া গরীবদের পক্ষে কঠিন ছিল। তাঁহাদের নিকট যদিও প্রচুর পরিমাণে মালদৌলত ছিল; কিন্তু তৎপ্রতি বিন্দুমাত্রও মনের টান ছিল না।

জনৈক ছাহাবী মৃত্যুকালে অঝোরে কাঁদিতেছিলেন। অন্যান্যরা তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন যে, খোদার ফযলে তুমি হযরতের সঙ্গী হইয়া অমুক অমুক জেহাদে শরীক হইয়া খোদার পথে ইসলামের বহু খেদমত করিয়াছ। ইনশাআল্লাহ্ হক তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করিবেন। অতএব, কান্নাকাটি করিয়া মন হাল্কা করিও না। তিনি উত্তরে বলিলেন, রাসূলে খোদা (দঃ)-এর আমলে আমরা খুবই নিঃস্ব ছিলাম। ওসমান ইবনে মায্উনের এন্তেকাল হইলে কাফনের জন্য মাত্র একটি ছোট কম্বল ছিল। উহা দ্বারা মাথা ঢাকিলে পা খোলা থাকিত। আর পা ঢাকিলে মাথা খোলা থাকিত। হুযূর (দঃ) নির্দেশ দেন যে, কম্বল দ্বারা মাথা ঢাকিয়া দাও এবং লতা-পাতা দ্বারা পা ঢাকিয়া দাও। অথচ আজ আমাদের কাছে এত মালদৌলত রহিয়াছে যে, মাটি ছাড়া উহার অন্য কোন জায়গা নাই।

ছাহাবীর এই উক্তির দুই রকম অর্থ বর্ণনা করা হইয়াছে। (১) জমিনে পোঁতিয়া ফেলা ব্যতীত এই মালদৌলতের অন্য কোন জায়গা নাই। (২) দালান-কোঠা নির্মাণে ব্যয় করা ব্যতীত এই টাকা-পয়সা অন্য কোন কাজে আসিবে না। ইহাতে বুঝা গেল যে, ছাহাবীগণ অতিরিক্ত টাকা-পয়সা জমা হইয়া গেলে আনন্দিত না হইয়া বরং ক্রন্দন করিতেন।

বন্ধুগণ, এই জাতীয় ধনীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ছূফীগণ মতভেদ করিয়াছেন যে, ছবর উত্তম, না শোকর (কৃতজ্ঞতা) উত্তম? ছূফীদের উক্তিতে শাকের (কৃতজ্ঞ) বলিয়া ছাহাবীদের ন্যায় ব্যক্তিকেই বুঝানো হইয়াছে। আমাদের ন্যায় হারামখোর ধনীদিগকে বুঝান হয় নাই। আমরা অহরহ খোদার নেয়ামত ভোগ করিয়া পাপ কাজে আরও বেশী উৎসাহী হইয়া পড়ি। আমাদের যুগের ধনীদিগকে দেখিলে ছূফীগণ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা ধৈর্যশীল ব্যক্তিকেই উত্তম বলিতেন। (তবে কোন কোন ধনী ইহা হইতে স্বতন্ত্র)

এমতাবস্থায় আজকালের ধনীদিগকে ধর্ম বিষয়ে পিছনে ফেলিয়া যাওয়া মোটেই কঠিন নহে। আশ্চর্যের বিষয়, তা সত্ত্বেও আমাদের চৈতন্যোদয় হয় না। আমরা যেমন দুনিয়াদারীতে ধনীদের পিছনে তদ্রূপ ধর্ম বিষয়েও তাহাদের অপেক্ষা বেশী অগ্রসর নই। বিশেষ করিয়া আলেমদের এ বিষয়ে অবশ্যই লজ্জা হওয়া উচিত। তাহাদের কর্তব্য হইল—ধনীগণ যেরূপ দুনিয়ার ব্যাপারে উন্নতি করিতে ক্লান্ত হয় না, তদ্রূপ তাহাদেরও দ্বীনদারীর উন্নতিতে অক্লান্ত চেষ্টা করা। আমি যে আয়াতখানি তেলাওয়াত করিয়াছি, উহাতে ইহার একটি সহজ পন্থা বর্ণিত হইয়াছে।

তাকওয়ার ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ○

www.BANGLAKITAB.com

'হে বিশ্বাসীগণ! খোদাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হইয়া যাও।' ইহাতে প্রথমতঃ তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক উদ্দেশ্য অর্জনের বেলায় উহার উচ্চস্তরই লক্ষ্য হইয়া থাকে। এখন প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাকওয়া ধর্মের উচ্চ স্তর কিনা। কোরআন ও হাদীসে মনোনিবেশ করিলে এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। কোরআন শরীফে তাকওয়ার নির্দেশ ও উহার ফযীলত সম্ভবতঃ অন্যান্য বিষয় হইতে অনেক বেশী উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। শরীঅতে তাকওয়া শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভয় করা ও বাঁচিয়া থাকা। গভীর মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকাই তাকওয়ার আসল উদ্দেশ্য, তবে উহার কারণ হইল ভয় করা। কেননা, অন্তরে কোন জিনিসের প্রতি ভয় থাকিলেই মানুষ উহা হইতে বাঁচিয়া থাকে। اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً আয়াতে তাকওয়া ভয় করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বাঁচিয়া থাকা অর্থে বহু আয়াত ও হাদীসে ব্যবহৃত হইয়াছেঃ اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 'এক টুকরা খেজুর দান করিয়া হইলেও জাহান্নাম হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা কর।' এই হাদীসে 'তাকওয়া' বাঁচিয়া থাকা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

মোটকথা, উভয় অর্থে তাকওয়া শব্দের ব্যবহার আছে। তন্মধ্যে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকাই 'তাকওয়ার' আসল উদ্দেশ্য। ভয় করা সাধারণতঃ আসল উদ্দেশ্য নহে; বরং উহা গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকার উপায় ও কারণ মাত্র। নিম্নোক্ত হাদীস ইহার দলীল। হুযূর (দঃ) এইরূপ দো'আ করিতেনঃ

وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট তোমার এই পরিমাণ ভয় প্রার্থনা করি, যাহা আমার মধ্যে ও গোনাহের মধ্যে আড়াল হয়।" ইহাতে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ ভয় উদ্দেশ্য নহে। কেননা, যাহা উদ্দেশ্য, তাহার প্রত্যেকটি স্তর কাম্য হইয়া থাকে। হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, ভয় একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই কাম্য। ঐ সীমার অতিরিক্ত কাম্য নহে। এই সীমা হইল, যে পরিমাণ ভয় গোনাহ্‌র মধ্যে আড়াল হইতে পারে সেই পরিমাণ লাভ করা। হুযূর (দঃ) এই হাদীসে مَاتَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ কথাটি যুক্ত করিয়া এমন একটি তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, যাহা আধ্যাত্মপথের পথিকগণ বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার পর জানিতে পারে। হুযূর (দঃ) এই বিষয়টি মাত্র দুইটি শব্দে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই তত্ত্ব হইল, বাহ্যতঃ খোদার ভয় খুব ভাল জিনিস বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং ইহা যত বেশী হইবে ততই মঙ্গল। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোতে দেখা গিয়াছে যে, খোদা-ভীতি সীমা ছাড়াইয়া গেলে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়।

প্রথমতঃ, বেশী ভীতির কারণে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সর্বদাই চিন্তায় ডুবিয়া থাকে। স্বাস্থ্যের ত্রুটি দেখা দিলে স্বভাবতঃই আমলে ত্রুটি না হইয়া পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, ভীত ব্যক্তিকে দেখিয়া অন্যান্য মুসলমানদের মনোবল ভাঙ্গিয়া যায়। তাহারা মনে করিতে বাধ্য হয় যে, খোদাকে রাযী করা বড় কঠিন ব্যাপার, সর্বদা চিন্তার অনলে দগ্ধ হইতে হয়।

তৃতীয়তঃ, খোদা-ভীতি সীমাতিরিক্ত প্রবল হইয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি খোদার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, নৈরাশ্য কুফরের নামান্তর। তাছাড়া নিরাশ হওয়ার ফলে সে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। সে মনে করে, যখন আমি খোদার রহমতের যোগ্যই নহি, তখন এত পরিশ্রম করিয়া লাভ কি? ফলে সে সমস্ত কাজকর্ম ছাড়িয়া দেয়।

www.BANGLAKITAB.com

খোদা-ভীতি প্রবল হইয়া গেলে উপরোক্ত অনিষ্টসমূহ দেখা দেয়। তখন আধ্যাত্মপথের পথিক উপলব্ধি করিতে পারে যে, ভীতির সকল স্তরই কাম্য নহে। কিন্তু হযরত (দঃ) মাত্র দুইটি শব্দের মাধ্যমে ইহার স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অতএব, প্রমাণিত হইল যে, তাকওয়ার আসল উদ্দেশ্য হইল গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা। ইহা যে ধার্মিকতা তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা, যাবতীয় ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদি পালন করা এবং সমস্ত হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা ইত্যাদি সবকিছুই এই তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। শরীঅতের কোন উদ্দেশ্যই ইহার গন্ডীর বাহিরে নয়। নামাযও পড়িতে হইবে, কেননা, নামায ছাড়িয়া দেওয়া গোনাহ্। যাকাতও দিতে হইবে, কারণ, যাকাত না দেওয়াও গোনাহ্। এইরূপে সমস্ত আদিষ্ট কাজকর্ম পালন না করাও গোনাহ্। অতএব, বুঝা গেল যে, এই তাকওয়ার মধ্যে যাবতীয় আদিষ্ট বিষয় পালন করারও নির্দেশ আছে এবং সমুদয় হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকারও তাকিদ আছে। বলা বাহুল্য, এই দুইটিই হইতেছে পূর্ণ ধার্মিকতার অঙ্গ। অতএব, তাকওয়া যে পূর্ণ ধার্মিকতা ইহাতে কোন সন্দেহ রহিল না।

তাকওয়া যে পূর্ণ ধার্মিকতা তৎসম্বন্ধে আরও একটি দলীল আছে। তাহা হইল এই হাদীসঃ اَلَا اِنَّ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى صَدْرِهٖ "রাসূলে খোদা (দঃ) আপন পবিত্র বক্ষের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, শুন! তাকওয়া এখানে নিহিত আছে।" অর্থাৎ, তাকওয়ার স্থান হইল অন্তর। এই হাদীসের সহিত আরও একটি হাদীস যোগ করুনঃ

اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ ○

অর্থাৎ, "দেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে। উহা ঠিক থাকিলে সমস্ত দেহই ঠিক থাকে। আর উহা বিগড়াইয়া গেলে সমস্ত দেহই বিগড়াইয়া যায়। জানিয়া রাখ, উহা হইল অন্তর।"

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্তরের সংশোধনই কামেল সংশোধন। আর প্রথমোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তাকওয়ার আসল আবাসস্থল অন্তর। কাজেই তাকওয়া দ্বারা অন্তরের সংশোধন হয়। অতএব, এই দুই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাকওয়া হইলে পূর্ণ সংশোধনও হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই পূর্ণ সংশোধনই হইল পূর্ণ ধার্মিকতা। এইভাবে তাকওয়ার অর্থ পূর্ণ ধার্মিকতা হওয়া প্রমাণিত হইয়া গেল।

হাদীসে অন্তরকে তাকওয়ার আবাসস্থল বলার কারণ এই যে, খোদা-ভীতির কারণেই তাকওয়া (গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা) লাভ হইয়া থাকে। আর অন্তরই খোদা-ভীতির প্রকৃত বাসস্থল। এ পর্যন্ত আয়াতের প্রথমভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

ছাদেকীন (সত্যবাদীগণ)-এর ব্যাখ্যাঃ দ্বিতীয়ভাগ অর্থাৎ, كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ "সত্যবাদীদের সঙ্গী হইয়া যাও" সম্বন্ধে আমি বলিয়াছি যে, ইহা প্রথম অংশে বর্ণিত উদ্দেশ্যটি হাছিল করার একটি উপায়। ইহার সারকথা হইল মোত্তাকী (খোদাভীরু)-দের সঙ্গ লাভ করা। আয়াতে ছাদেকীন শব্দের অর্থ কামেলীন (পূর্ণ ধার্মিকগণ)। এখানে ছাদেকীন শব্দ দ্বারা উহার প্রসিদ্ধ অর্থ —(যাহারা সত্য কথা বলে) বুঝান হয় নাই; বরং উহা দ্বারা পরিপক্ক ধার্মিক ব্যক্তিদিগকে বুঝানো হইয়াছে। আমাদের পরিভাষায়ও 'পাক্কা' ব্যক্তিকে সত্যবাদী বলা হয়। এই অর্থেই হক তা'আলা কোন কোন পয়গম্বরকে 'ছিদ্দীক' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন, আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

www.BANGLAKITAB.com

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ※

"ইব্‌রাহীমকে স্মরণ কর। তিনি ছিদ্দীক (পরিপক্ক) ও নবী ছিলেন।" মর্যাদা হিসাবে নবীর পরেই ছিদ্দীকের স্থান। এর পর শহীদ, এর পর ছালেহ। এক আয়াতে হক তা'আলা উক্ত শ্রেণী-সমূহকে এইরূপ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

এই সমস্ত লোক খোদার নেয়ামতপ্রাপ্তদের অর্থাৎ নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহীনদের সহিত বসবাস করিবে। সঙ্গী হিসাবে তাঁহারা খুবই উত্তম।

ধর্মে পরিপক্ক হওয়া মানেই ধর্মে পূর্ণতা অর্জন করা। সুতরাং ছাদেকীন অর্থ যে কামেলীন, তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। আরও একখানি আয়াত হইতে ইহার দলীল পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ الخ বরং অভূতপূর্বভাবে এই আয়াত হইতে আমার উভয় দাবী প্রমাণিত হইতেছে। অর্থাৎ, তাকওয়া ও ছিদক উভয়টির অর্থ পূর্ণ ধার্মিকতা। পূর্ণ আয়াত এইরূপ ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

"তোমরা আপন মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরাইয়া লইবে—ইহাতেই সমস্ত নেকী সীমাবদ্ধ নহে। কিন্তু (প্রকৃত) নেকী হইল—যে ব্যক্তি খোদার অস্তিত্ব ও গুণাবলীর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের (অস্তিত্বের) প্রতি, আসমানী কিতাবের প্রতি এবং সকল পয়গম্বরদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। আর খোদার মহব্বতে আপন (অভাবগ্রস্ত) আত্মীয়দিগকে, (নিঃস্ব) এতীমদিগকে, অন্যান্য দরিদ্রদিগকে, (রিক্তহস্ত) মুসাফিরদিগকে, (অপারগ অবস্থায়) যাচ্ঞাকারীদিগকে এবং (বন্দী ও গোলামদিগকে) মুক্ত করার কাজে অর্থ ব্যয় করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়। যাহারা (কোন জায়েয কাজের) অঙ্গীকার করিয়া উহা পূর্ণ করে এবং যাহারা অভাব-অনটনে, অসুখ-বিসুখে এবং যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্যশীল উহারাই সত্যবাদী এবং উহারাই তাকওয়া অবলম্বনকারী।"

মোটকথা, যাহারা উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী, তাঁহারাই সত্যবাদী ও মোত্তাকী। ধর্মের যাবতীয় অঙ্গসমূহ এই আয়াতে মোটামুটি উল্লিখিত হইয়াছে। কোন অঙ্গ বাদ পড়ে নাই। সুতরাং এই গুণসমূহই হইতেছে পূর্ণ ধার্মিকতা। সর্বশেষ আয়াতে এইসব গুণের অধিকারীদিগকে সত্যবাদী ও মোত্তাকী বলায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পূর্ণ ধার্মিক হইলেই মোত্তাকী ও ছাদেক হওয়া যায়। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, তাকওয়া ও ছিদ্‌ক মানেই পূর্ণ ধার্মিকতা।

www.BANGLAKITAB.com

উক্ত নেকীর আয়াতের তফ্‌সীর ঃ উদ্ধৃত আয়াতসমূহে ধর্মের যাবতীয় অঙ্গই উল্লিখিত হইয়াছে কিনা, এক্ষণে তাহাই অনুধাবন করুন। শরীঅতে যে সমস্ত আদেশ নিষেধ রহিয়াছে, উহাদের সারমর্ম হইল তিনটি বিষয় ঃ (১) আকায়েদ, (২) আমল, (৩) চরিত্র। যাবতীয় খুঁটিনাটি মাসআলা মাসায়েল এই তিনটি বিষয় হইতেই উদ্ভূত। বর্ণিত আয়াতে এই তিনটি বিষয়ের প্রধান প্রধান বিভাগগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া এই আয়াতখানি 'ব্যাপক অর্থ-বোধক' বাক্যাবলীর অন্যতম। لَيْسَ الْبِرَّ এখানে بر অর্থ নেকী। ইহার সহিত (ال) আলিফ ও লাম যুক্ত করা হইয়াছে বিশেষ নেকী বুঝাইবার জন্য। কাজেই আয়াতের অর্থ হইবে—পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া লওয়াই যথেষ্ট নেকী নহে যে, ইহা লইয়াই সন্তুষ্ট হওয়া যায়। আয়াতে প্রশ্ন হইতে পারিত যে, কেবলা মুখ হওয়া শরীঅতের নির্দেশ এবং শরীঅতের আদিষ্ট কাজ তো নেকী হওয়া অনিবার্য। তাসত্ত্বেও আয়াতে নেকী নহে বলা হইল কেন? উপরোক্ত ব্যাখ্যার মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর হইয়া গিয়াছে। অন্যান্যরা এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নরূপে দিয়াছেন। কিন্তু আমার বর্ণিত উত্তরটি সবচাইতে সহজ; উত্তরটি এই মুহূর্তেই আমার মনে জাগিয়াছে। ইহার সারমর্ম এই যে, আয়াতে কেবলামুখী হওয়া যে একেবারেই নেকী নহে, তা বলা উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহা যে, যথেষ্ট নেকী নহে তাহাই উদ্দেশ্য।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন জাগে যে, পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানো যথেষ্ট নেকী নহে—এই বিষয়টি কেন বর্ণনা করা হইল? উত্তর এই যে, ইহার পূর্বে কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারটি বর্ণনা করা হইয়াছে। কাফের ও মুশরিকদল ইহা লইয়া ব্যাপক হট্টগোল আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। তাহারা জোরেসোরে প্রচার করিত যে, মুসলমানদের ধর্ম বেশ অদ্ভুত বৈচিত্রময় ধর্ম। তাহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে মুখ ফিরায়। ইহাতে হক তা'আলা কাফেরদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা এই আলোচনায় এমনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছ যে, মনে হয়, পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোই ধর্মের বড় ও প্রধান উদ্দেশ্য। অথচ ইহা উদ্দেশ্য নহে; বরং একটি উদ্দেশ্যের শর্ত বা উপায়সমূহের মধ্যে গণ্য। অতএব, উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়া—উদ্দেশ্য নহে—এমন বিষয় লইয়া আলোচনায় মাতিয়া উঠা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নহে। পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করা যথেষ্ট নেকী নহে; বরং যাহা যথেষ্ট নেকী, তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে। উহা পালন করিতে যত্নবান হও।

আয়াতে অন্যান্য দিকগুলিকে বাদ দিয়া শুধু পূর্ব ও পশ্চিম দিককে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করার একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে। ইহার উদ্দেশ্য এই নয় যে, কেবলা কেবলমাত্র পূর্ব ও পশ্চিম দিকদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা, যে সব দেশ হইতে মক্কা শরীফ উত্তর দিকে অবস্থিত, ঐ সমস্ত দেশের অধিবাসীদের কেবলা উত্তর দিকে। তদ্রূপ যে স্থান হইতে মক্কা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, সে স্থানের কেবলা দক্ষিণ দিক। মদীনাবাসীদের কেবলা দক্ষিণ দিক। এই জন্য হাদীসে তাহাদের জন্য شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, প্রস্রাব-পায়খানার সময় পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল যে, কেবলা পূর্ব বা পশ্চিম দিকেই সীমাবদ্ধ নহে। তা সত্ত্বেও আয়াতে বিশেষ করিয়া এই দুইটি দিককে উল্লেখ করার সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, সকল দিক হইতে এই দুইটি দিক জনসমাজে প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যখন এইগুলি উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে, তখন অন্যান্য দিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

www.BANGLAKITAB.com

তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যে পার্থক্য বাহ্যতঃ একটি অপরটির বিপরীত হওয়ার কারণে অধিক সুস্পষ্ট। প্রত্যক্ষভাবে সর্বপ্রথম এই দুইটি দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। এর পর ইহাদের সাহায্যে আমরা অন্যান্য দিক সম্বন্ধে জ্ঞাত হই। পূর্ব ও পশ্চিম দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ উত্তর ও দক্ষিণ দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নহে। প্রত্যেকেই জানে যে, যে দিক হইতে সূর্য উঠে, উহা পূর্বদিক এবং যে দিকে অস্ত যায়, উহা পশ্চিম দিক। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম দিক জানা ব্যতীত উত্তর ও দক্ষিণ দিক জানা যায় না। তাই উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পরিচয় দিতে যাইয়া এইরূপ বলা হয়ঃ পূর্ব দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে ডান হাত যে দিকে থাকে, উহা দক্ষিণ দিক এবং বাম হাত যে দিকে থাকে, উহা উত্তর দিক। অতএব, পূর্ব ও পশ্চিম দিক হইল মূল দিক এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইল শাখা দিক। মূল দিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলে শাখা দিক যে হইবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। এতদ্ব্যতীত নামাযে সামান্য দিকভ্রষ্টতা ক্ষতিকর নহে। যাহাদের কেবলা পূর্বদিক, তাঁহারা যদি সামান্য উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকে বক্র হইয়া যায়, তবে উহাতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। এই হিসাবে দেখিলে আয়াতে উত্তর ও দক্ষিণ দিক বাদ পড়ে নাই; বরং পূর্ব ও পশ্চিমের সহিত গৌণভাবে ইহাদেরও উল্লেখ আছে।

মোটকথা, যে কোন দিকে মুখ করা যথেষ্ট নেকী নহে। যথেষ্ট নেকী পরে উল্লিখিত হইয়াছে وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ الخ অর্থাৎ, খোদার প্রতি ঈমান আনা..... ইত্যাদি। এই আয়াতের ব্যাখ্যা দুই প্রকারে করা যায়ঃ (১) مسند اليه -এর দিকে مضاف কে উহ্য মানিয়া, অর্থাৎ ولكن ذا البر من امن بالله الخ এবং (২) مسند -এর দিকে مضاف কে উহ্য মানিয়া। অর্থাৎ, ولكن البر بر من امن بالله الخ উভয় ব্যাখ্যারই সার এক।

আকায়েদের বর্ণনাঃ আয়াতে 'যথেষ্ট নেকী'র বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যত মাসায়েল আছে, সবগুলির প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনা প্রসঙ্গে পুরস্কার, শাস্তি, হিসাব-কিতাব, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদির মাসায়েল আসিয়া গিয়াছে। والملئكة 'ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনে'—ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ প্রসঙ্গে যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিও ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবে বিশেষ করিয়া ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, শরীঅত সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার ব্যাপারে তাহারাই নির্ভরযোগ্য মধ্যস্থল বা মাধ্যম والكتاب অর্থাৎ, 'আসমানী কিতাবে ঈমান আনে'—এখানে কিতাব শব্দটি একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ আসমানী কিতাব অনেক এবং সবগুলির উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। (অবশ্য রহিত কিতাবের উপর আমল করা জায়েয নহে।) এই কারণেই অন্যান্য আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমনঃ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ الخ কিন্তু এখানে একবচন ব্যবহার করিয়া এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই কোরআন এমন ব্যাপক যে, ইহাতে সমস্ত আসমানী কিতাবের বিষয়বস্তুর সমাবেশ রহিয়াছে। কাজেই ইহার উপর ঈমান আনিলে সবগুলির উপর ঈমান আনা হইবে। এ প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, প্রত্যেক আসমানী কিতাব অপর আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনিতে নির্দেশ দেয়। সুতরাং সবগুলি মিলিয়া যেন একই কিতাব এবং সবগুলির উপর ঈমান আনা এক কিতাবের উপর ঈমান আনার ন্যায়। কেহ এক কিতাব মানিয়া অন্য কিতাব অস্বীকার করিলে সে প্রকৃতপক্ষে কোন কিতাবই মানে না। কিন্তু শুধু ঈমান আনা সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। সকল কিতাবের উপর আমল করা

www.BANGLAKITAB.com

জায়েয নহে। আমল শুধু সর্বশেষ কিতাবের উপরই করিতে হইবে। কেননা, ইহা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে 'মনসুখ' (রহিত) করিয়া দিয়াছে। والنبيين 'এবং পয়গম্বরদের প্রতিও ঈমান আনে'। এই পর্যন্ত মৌলিক আকায়েদ বর্ণিত হইয়াছে। এর পর আমল ও চরিত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমলের প্রকারভেদঃ শরীঅতের আমল দুই প্রকার। (১) এবাদত ও (২) পারস্পরিক ব্যবহার। ইহাও দুই প্রকার। একটির সম্পর্ক ধনদৌলতের সহিত ও অপরটির সম্পর্ক অন্যান্য বিষয়ের সহিত। যেমন—বিবাহ, তালাক, ক্রীতদাসকে মুক্ত করা, অপরাধীদিগকে শাস্তি দান ইত্যাদি। এবাদতও দুইভাগে বিভক্ত। শারীরিক এবাদত ও আর্থিক এবাদত। তদ্রূপ চরিত্রও দুই প্রকার। সচ্চরিত্রতা ও অসচ্চরিত্রতা। সচ্চরিত্রতা অর্জন ও অসচ্চরিত্রতা বর্জন শরীঅতের কাম্য। আয়াতে আকায়েদের বর্ণনার পর এবাদতের মৌলিক বিষয়গুলি বর্ণনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে আর্থিক এবাদতকে প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা, অনেকেই শারীরিক এবাদতের বেলায় সাহসিকতার পরিচয় দেয়, কিন্তু আর্থিক এবাদতের সময় তাহাদের অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নরূপঃ

گر جاں طلبی مضائقہ نیست ـ گر زر طلبی سخن دریں ست

(গর জান তলবী মুযায়াকা নীস্ত + গর যর তলবী সখুন দরীনাস্ত)

অর্থাৎ, "যদি প্রাণ চাও বিনা দ্বিধায় দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু যদি টাকা পয়সা চাও, তবে ইহাতে কথা আছে।"

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ "এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতে আত্মীয়দিগকে ধনসম্পদ দান করে।" এখানে على حبه -এর সর্বনামটি যদি الله শব্দের দিকে ফিরে, তবে এখানে চরিত্রশাস্ত্রের একটি বড় মূলনীতি ব্যক্ত হইয়াছে বলা যায়। অর্থাৎ, খোদার পথে খোদার মহব্বতেই মাল দান করা উচিত। অতএব, আয়াতে দুইটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছেঃ (১) খোদার সহিত মহব্বত সৃষ্টি করা উচিত। শুধু আইনগত সম্পর্ক রাখা উচিত নহে। (২) এখলাছ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং দান করার সময় রিয়া ও প্রশংসা লাভের আশা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এখলাছ আধ্যাত্মিক চরিত্রের একটি বড় স্তম্ভ।

আর যদি সর্বনামটি مال শব্দের দিকে ফিরে, তবে অর্থ হইবে—যে মালের প্রতি মহব্বত ও মনের টান থাকে, তাহা খোদার পথে ব্যয় করে। এমতাবস্থায় প্রথমতঃ, ইহাতে ব্যয় করার আদব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, খোদার পথে উত্তম মাল ব্যয় করা উচিত, নিকৃষ্ট মাল খরচ করা অনুচিত। দ্বিতীয়তঃ, তাছাউফ শাস্ত্রের একটি মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ, মালকে মহব্বত করা একটি হীন স্বভাব। ইহার প্রতিকার এই যে, কোন মালের প্রতি মহব্বত জন্মিলেই উহা খোদার পথে দান করিয়া দাও। কয়েকবার এরূপ করিলে মালকে মহব্বত করার রোগটি সারিয়া যাইবে।

বিবি-বাচ্চার ভরণ-পোষণ করা পুরুষের উপর ওয়াজিব। অন্যান্য দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের খেয়াল রাখা এবং তাহাদিগকে সময়ে সময়ে কিছু কিছু দান করা মোস্তাহাব। ذوى القربى শব্দ দ্বারা সকল প্রকার আত্মীয়বর্গকে বুঝানো হইয়াছে।

وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ "এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদিগকেও দান করে।" ইহা নফল দান-খয়রাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যাকাতের কথা পরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

এখানে দুইটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম প্রশ্ন এই যে, আর্থিক এবাদতকে শারীরিক এবাদতের পূর্বে উল্লেখ করা হইল কেন? ইহার উত্তর পূর্বেও দেওয়া হইয়াছে যে, কোন কোন লোক খুব বেশী কৃপণ হইয়া থাকে। তাহারা শারীরিক এবাদতে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দেয়; কিন্তু অর্থ দান করার বেলায় গা বাঁচাইয়া চলে। কাজেই গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে প্রথমে আর্থিক এবাদতকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আর্থিক এবাদতের মধ্যেও নফল দান খয়রাতকে ওয়াজিব দান-খয়রাত তথা যাকাতের পূর্বে উল্লেখ করা হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, কোন কোন লোক খোদার সহিত শুধু আইনগত সম্পর্ক রাখিতে চায়। তাহারা ফরয যাকাত ব্যতীত অন্য কোনরূপ দান-খয়রাত করে না। এরূপ করা গোনাহ্ নহে সত্য, কিন্তু নিঃসন্দেহে খোদার সহিত দুর্বল সম্পর্কের পরিচায়ক। এই জন্য নফল দান-খয়রাতের কথা প্রথমে উল্লেখ করিয়া হক তা'আলা ইঙ্গিত করিলেন যে, যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হেতু ইহা তো দিবেই—তৎসহ মাঝে মাঝে কিছু কিছু দান-খয়রাতও করা উচিত।

দেখুন, যদি কোন প্রিয়জন বা কোন বাদশাহ্ আমাদিগকে বলে, এই ব্যাপারে তোমরা দুই টাকা ব্যয় কর। চিন্তা করুন, তখন আমাদের আনন্দের সীমা থাকিবে কি? তখন আমরা দুইটি টাকা খরচ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব না; বরং প্রিয়জন বা বাদশাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বা তাঁহার দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় হওয়ার জন্য দুই-এর স্থলে দশ টাকা খরচ করিয়া ফেলিব। অতএব, খোদার সহিত শুধু আইনগত সম্পর্ক রাখা উচিত নহে।

এই সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য নফল দানকে ওয়াজিব দান এমন কি শারীরিক এবাদত অর্থাৎ, নামাযেরও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পর যখন যাকাতের বর্ণনা আসিয়াছে, তখন আবার নামাযকে যাকাতের আগে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহাতে বুঝা যায় যে, মর্যাদার দিক দিয়া নামাযই যাকাত হইতে উত্তম। তবে নামায ও যাকাতের পূর্বে আর্থিক ছদকার উল্লেখের পিছনে গুরুত্ব বুঝানই উদ্দেশ্য—মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নহে। আর্থিক এবাদত হইতে নামাযের মর্যাদা বেশী এবং আর্থিক নফল ছদকা হইতে যাকাতের মর্যাদা অধিক। সোব্‌হানাল্লাহ্, খোদার কালামে প্রত্যেক বিষয়ের মর্যাদার প্রতি কত লক্ষ্য রাখা হইয়াছে! এই সব কারণেই এই কালাম দেখিয়া মানব-বুদ্ধি ঘুরপাক খাইতে থাকে। মানুষের পক্ষে এতসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাস্তবিকই অসম্ভব।

وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ 'যাচ্ঞাকারীদিগকে দান করে এবং ক্রীতদাস মুক্ত করার ব্যাপারেও অর্থ ব্যয় করে।' ইহাও নফল দান-খয়রাতের এক অংশ। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র যাহারা অপারগ অবস্থায় যাচ্ঞা করে এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা বানাইয়া না লয়, তাহাদিগকেই দান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা সবল দেহের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা বানাইয়া লয়, তাহাদিগকে দান করা জায়েয নহে, তাহাদের জন্য ভিক্ষা চাওয়াও জায়েয নহে।

এই যুগে হযরত মাওলানা গঙ্গুহী (রঃ) সর্বপ্রথম এই মাসআলাটির প্রতি আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি একদিন বলিলেন, একটি মাসআলা বলিতেছি। জানি, ইহাতে প্রচুর গালি খাইতে হইবে। সত্যসত্যই এই মাসআলাটি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই চতুর্দিক হইতে আপত্তি ও নিন্দাবাদের বান বর্ষিত হইতে থাকে। কেহ বলিল, ইহার অর্থ হইল কোন ভিক্ষুককে কিছু দান

www.BANGLAKITAB.com

করিও না, সব আমাকে দান কর। আবার কেহ বলিল, নূতন মৌলবী আবির্ভূত হইয়াছেন। নতুবা আজ পর্যন্ত কেহ এই সব ভিক্ষুকদের দান করাকে হারাম বলে নাই।

আশেকের মর্যাদাঃ কিন্তু মাওলানা তো আল্লাহ্‌র শরীঅতের আশেক ছিলেন। আশেক কখনও গালিগালাজের পরওয়া করে না। কবি চমৎকার বলিয়াছেনঃ

گرچه بدنامیست نزد عاقلاں ـ ما نمی خواهیم ننگ و نام را

(গরচে বদনামীস্ত নযদে আকেলাঁ + মা নামী খাহেম নঙ্গ ও নাম রা)

"যদিও ইহা জ্ঞানীদের নিকট বদনামী, কিন্তু আমরা বদনামী ও নেকনামীর আকাঙ্ক্ষা করি না।" এই অর্থেই উর্দুতেও একটি কাব্য পংক্তি আছে। তবে উহা কবিত্বের দিক দিয়া অনেক নিম্ন মানের। জানি না, ফারসী কবিতার সম্মুখে উর্দু কবিতা এত নিরস মনে হয় কেন? আলোচ্য বিষয়ের সহিত মিল থাকায় পংক্তিটি পড়িয়া দিতেছিঃ

عاشق بدنام کو پروائے ننگ و نام کیا ـ اور جو خود ناکام هو اسکو کسی سے کام کیا

"অপমানিত আশেকের আবার দুর্নাম ও সুনামের পরওয়া কিসের? যে নিজেই অকৃতকার্য তাহার আবার পরের সহিত কি সংস্রব?"

অকৃতকার্যতার অর্থ হযরত হাজী সাহেব (রঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, ভাই! যাহারা কৃতকার্য হইতে চায়, তাহারা অন্য কোন বুযুর্গের নিকট গমন করুন। পক্ষান্তরে যাহারা অকৃতকার্য হইতে চান, তাহারা আমার নিকট আসুন। এর পর তিনি খুব আস্তে বলিলেন, অকৃতকার্যতার অর্থ কি জান? ইহার অর্থ হইল এশক। কারণ, আশেক প্রেমাস্পদের অন্বেষণ ও আগ্রহের আতিশয্যের কারণে প্রত্যেক স্তরে নিজকে অকৃতকার্যই মনে করে। কোন অবস্থা ও স্তরে পৌঁছিয়াও সে সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে না। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ থাকে। ফলে সে সব সময়ই অকৃতকার্য অবস্থায় থাকে। এই কারণেই চিশ্‌তিয়া তরীকায় সিদ্ধি লাভের পরও বিরহ জ্বালার পরিসমাপ্তি হয় না। তবে তাহা শুধু দুনিয়াতেই। এখানে মিলন হইতে পারে না বলিয়া তৃপ্তি লাভ হয় না। কিন্তু আখেরাতে তৃপ্তি লাভ হইয়া যাইবে।

জনৈক সাহেবে হাল ছূফী বলেনঃ

اِنَّ فِى الْجِنَانِ جَنَّةً لَّيْسَ فِيْهَا حُوْرٌ وَّلَا قُصُوْرٌ وَّلٰكِنَّ فِيْهَا اَرِنِىْ اَرِنِىْ

"জান্নাতসমূহের মধ্যে একটি জান্নাত আছে, যাহাতে কেবল হুর বা প্রাসাদ নাই। তথায় যাহারা বসবাস করিবে, তাহারা সর্বদাই হক তা'আলার নিকট শুধু 'দেখা দাও, দেখা দাও' নিবেদন করিতে থাকিবে।"

অনেকেই ভুলবশতঃ এই উক্তিটিকে হাদীস মনে করে। প্রকৃতপক্ষে ইহা জনৈক ছূফীর উক্তি। তাহাও আবার ভ্রান্তিপূর্ণ। আমার মনে হয়, এই ছূফী জান্নাতকে দুনিয়ার ন্যায় মনে করিয়াছে। জান্নাতে তো প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী প্রেমাস্পদের মিলন লাভ করিবে। ফলে পুরাপুরি সান্ত্বনা লাভ হইবে এবং কোনরূপ ব্যাকুলতা বাকী থাকিবে না। কোরআনের আয়াতের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জান্নাতে মোটেই কোনরূপ কষ্ট ও ব্যাকুলতা থাকিবে না। আশেকের প্রাণ তো আখেরাতের আশায়ই দুনিয়ার দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছে। যদি সেখানেও ব্যাকুলতা থাকে এবং সান্ত্বনা না হয়, তবে ইহার ন্যায় চূড়ান্ত পর্যায়ের ব্যর্থতা আর কি হইতে পারে?

www.BANGLAKITAB.com

অথচ বিভিন্ন আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, জান্নাতে কোনরূপ দুঃখ-বেদনা থাকিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِىٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ ○

"জান্নাতে তোমাদের মনের আকাঙ্ক্ষিত সবকিছুই রহিয়াছে এবং তথায় তোমরা যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।"

দুনিয়াতে যেহেতু স্বভাবগত কারণে মিলন সম্ভব নহে—এইজন্য এখানে পুরাপুরি সান্ত্বনা হয় না, দুনিয়াতে মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি পূর্ণ মিলন বরদাশ্‌ত করিতে পারে না। কিন্তু আখেরাতে বরদাশ্‌ত করার ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে। খোদার সহিত সম্পর্কশীল ব্যক্তিগণ দুনিয়াতেও মিলন লাভ করেন। তবে উহাকে প্রকৃত মিলন বলা যায় না ; বরং উহা এক প্রকার উপস্থিতি। তাহাও আবার কোন সময় লাভ হয় এবং কোন সময় হয় না। তাই সাধক শীরাযী বলেনঃ

در بزم دور يك دو قدح دركش و برو ـ يعـنـى طمـع مدار وصـال دوام را

(দর বাযমে দওর এক দো কাদাহ্ দরকাশ ও বেরু + ইয়ানী তামা' মদার বেছালে দাওয়াম রা)

"শরাবের মজলিসে দুই এক পেয়ালা পান করিয়া চলিয়া যাও। অর্থাৎ, চিরমিলনের আশা করিও না।"

মোটকথা, আমি বলিতেছিলাম যে, আশেক দুর্নাম, অপমান ও গালিগালাজের পরওয়া করে না। তাই হযরত গঙ্গুহী (রঃ)ও ইহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। ফকীহগণও পরিষ্কার উল্লেখ করিয়াছেন যে, যাহারা অলিতে গলিতে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং ইহাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভিক্ষা করা হারাম। তাহাদিগকে কিছু দান করিলে তাহারা ভবিষ্যতে আরও ভিক্ষা করিতে উৎসাহিত হইয়া পড়ে। কাজেই তাহাদিগকে দান করা হারাম, ভিক্ষাবৃত্তিতে সাহায্য করার শামিল এবং হারামের সাহায্য করাও হারাম। অতএব, বলিষ্ঠ ও সবল লোকদের পক্ষে ভিক্ষা করা হারাম এবং তাহাদিগকে ভিক্ষা দেওয়াও হারাম।

وَفِى الرِّقَابِ ইহাতে কয়েদী ও ক্রীতদাস মুক্ত করার কথা বলা হইয়াছে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করাও এই পর্যায়ভুক্ত।

وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ "এবং নামায পাবন্দির সহিত পড়ে এবং যাকাত আদায় করে।" এখানে মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাকাতকে নামাযের পরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বান্দার হকের প্রকারভেদঃ এ পর্যন্ত আয়াতে শারীরিক ও আর্থিক এবাদতের প্রধান বিষয়গুলি বর্ণিত হইল। এর পর বান্দার হক উল্লিখিত হইয়াছেঃ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا "এবং তাহারা যখন কোন অঙ্গীকার করে, তখন তাহা পূর্ণ করে।" বান্দার হকসমূহের মধ্যে কতক এমন আছে, যাহা অঙ্গীকার পূর্ণ করা অপেক্ষা অগ্রগণ্য। যেমন, ঋণ পরিশোধ করা, আমানতে খিয়ানত না করা ইত্যাদি। তথাপি হক তা'আলা এখানে শুধু অঙ্গীকার পূর্ণ করার কথা উল্লেখ করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, তাহারা যখন বান্দার তাগাদাহীন হক আদায় করে (কারণ, অঙ্গীকার পূর্ণ করা পার্থিব আইনানুসারে জরুরী নহে, তবে কাহারও মতে দ্বীনদারী হিসাবে ওয়াজিব) তখন যেসব হকের পিছনে তাগাদা আছে, তাহা অবশ্যই আদায় করিবে। এই সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ওছিয়তকে ঋণ হইতে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বান্দার হকের মর্যাদাও জানা গেল যে, হক তা'আলা তাগাদাহীন হকের প্রতি যখন এত গুরুত্ব আরোপ

www.BANGLAKITAB.com

করিলেন, তখন তাগাদাবিশিষ্ট হক কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহা ছাড়া উদাহরণস্বরূপ এখানে কতিপয় হক উল্লেখ করিয়াছেন। নতুবা আরও অনেক প্রকার হক আছে। অনেকের ধারণা একমাত্র মালই বান্দার হক। অথচ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, বান্দার হক মালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; বরং ইহা ছাড়াও আরও অনেক প্রকার হক আছে।

হাদীসটি এইরূপঃ বিদায় হজ্জে প্রদত্ত খোৎবায় হুযূর (দঃ) ছাহাবীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا "ইহা কোন্ দিন?" ছাহাবাগণ উত্তরে বলিলেন, قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ "আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জ্ঞাত আছেন।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, اَلَيْسَ هٰذَا يَوْمُ النَّحْرِ 'ইহা কোরবানীর দিন নয় কি?' 'তাঁহারা বলিলেন, হাঁ, قَالُوْا بَلٰى ইহা হইতে ছাহাবীদের চূড়ান্ত শিষ্টাচার জানা যায়। তাঁহারা যে বিষয়টি জানিতেন, তাহাও আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি সমর্পণ করিয়া দিতেন। নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করিতেন না। অতঃপর হুযূর (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কোন্ স্থান?" এর পর আবার বলিলেন, "ইহা পবিত্র (মক্কা) শহর নয় কি?" ছাহাবাগণ সমস্বরে উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়'। অতঃপর তিনি মাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে নিজেই বলিলেন, "ইহা যিলহজ্জ মাস নয় কি?" ছাহাবাগণ বলিলেন, 'নিশ্চয়'। অতঃপর তিনি বলিলেনঃ

فَاِنَّ اَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا

"তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত পরস্পরের মধ্যে এমনি সম্মানিত, যেমন এই মাস, এই স্থান ও এই দিন সম্মানিত।" ইহাতে বুঝা গেল যে, কাহাকেও কষ্ট না দেওয়াও এক প্রকার বান্দার হক। যেমন, কাহাকেও অন্যায়ভাবে মারধর করা। দেশের শাসকবর্গ ও শিক্ষক ছাহেবান অহরহ এই হক নষ্ট করিতেছে। কাহারও ইজ্জত নষ্ট না করাও এক প্রকার বান্দার হক। সুতরাং কাহাকেও তিরস্কার করা, অপমান করা, অহেতুক কুধারণা পোষণ করা ইত্যাদি সবই হারাম। তদ্রূপ কাহারও গীবত করাও না-জায়েয। এমন কি কোরআন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইজ্জত সম্বন্ধীয় হকের মর্তবা যিনা ব্যভিচার ইত্যাদি হইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বিশেষতঃ কাহারও ইজ্জতের পরওয়া করি না। এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা অন্যের এক পয়সাও আত্মসাৎ করে না, আর্থিক হক আদায় করিতে ত্রুটি করে না। তাহারা নিজেদেরকে এই ভাবিয়া খুব পরহেযগার মনে করে যে, আমরা কাহারও হক নষ্ট করি না, কিন্তু অপরের ইজ্জত নষ্ট করার রোগে তাহারাও আক্রান্ত। আমাদের কোন বৈঠক গীবত হইতে খালি থাকে না। সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক, আলেমদের মজলিসেও নির্বিবাদে গীবত চলিতে থাকে। সবচেয়ে সর্বনাশের কথা এই যে, মাশায়েখের (পীর সাহেবদের) মজলিসও এই আপদ হইতে মুক্ত নহে। সাধারণ লোক তো সাধারণ লোকেরই গীবত করে। তাঁহাদের মধ্যে অনেক ফাসেকও রহিয়াছে, যাহাদের ইজ্জতের হক তত বেশী নহে। কিন্তু আলেমগণ গীবত করিলে সাধারণ লোকের গীবত করিবে না; বরং অপর আলেমেরই গীবত করিবে। তদ্রূপ মাশায়েখ সর্বদা মাশায়েখেরই গীবত করিবে। একজন যাহাতে অপরজন হইতে উন্নত না হইয়া যায় এবং একজনের শিষ্যসংখ্যা যাহাতে অপরজন হইতে বাড়িয়া না যায়—এই কারণে আলেম, পীরদের মজলিস গীবতে পরিপূর্ণ থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা খোদার প্রিয় ওলীদেরই গীবত করে। সুতরাং এ ব্যাপারে তাহারা সাধারণ লোকদের চেয়ে বেশী দোষী। মনে রাখিও, ইহা মামুলী ব্যাপার নহে।

www.BANGLAKITAB.com

লোকেরা ইহাকে মামুলী মনে করিয়া থাকে। অথচ অবস্থা এই যে, ইহা সমস্ত নামায রোযাকে ডুবাইয়া দিবে। তুমি যাহার ইজ্জত নষ্ট করিবে, কিয়ামতের দিন তোমার নেকীসমূহ তাহাকে দেওয়া হইবে। কাজেই ইজ্জতের হকের প্রতি নামায-রোযা হইতেও বেশী লক্ষ্য রাখা উচিত।

আরও একটি বিষয় মনে পড়িল। উহা এই যে, জান ও মালের হক মৃত্যুর পরই শেষ হইয়া যায়; কিন্তু ইজ্জতের হক মৃত্যুর পরও বাকী থাকে। মৃত্যুর পর যদি কাহাকেও মার, তবে সে তাহা অনুভব করিতে পারিবে না। ফলে ইহার কেছাছস্বরূপ তোমাকে মারা হইবে না। তদ্রূপ মৃত্যুর পর কাহারও ধন চুরি করিলে তাহা মৃতব্যক্তির ধন চুরি করা হইবে না; বরং ওয়ারিসদের ধন চুরি করা হইবে। কিন্তু মৃতব্যক্তির প্রতি কোন অপবাদ লাগাইলে বা তাহাকে মন্দ বলিলে, তখন তাহার গীবতের গোনাহ্ হইবে। এই পাপের কাফ্‌ফারা হিসাবে দো'আ ও এস্তেগফার করিতে হইবে। ইহাতে আশা করা যায় যে, খোদা তাহাকে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট করাইয়া লইবেন।

দেহ ও আত্মার সম্বন্ধঃ আমি বলিয়াছি যে, মৃতব্যক্তি আঘাত অনুভব করিতে পারে না। অথচ হাদীসে বলা হইয়াছেঃ كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا كَكَسْرِهِ حَيًّا "মৃত্যুর পর মুসলমানের অস্থি চূর্ণ করা জীবিতাবস্থায় তাহার অস্থি চূর্ণ করার ন্যায়।" ইহার উত্তর এই যে, এখানে মৃতাবস্থাকে সকল দিক দিয়াই জীবিতাবস্থার সহিত তুলনা করা হয় না। এরূপ করা হইলে বিচারে আঘাতের পরিবর্তে আঘাতকারীকেও আঘাত করা হইত। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা মৃতব্যক্তি ও জীবিত ব্যক্তি উভয়কেই সমান অনুভূতিশীল বলিয়া ধারণা করার অবকাশ নাই।

মৃত্যুর পরও দেহের সহিত আত্মার কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকে। পরিহিত পোশাকের সহিত আমাদের দেহের যে সম্পর্ক ঐ সম্পর্কও তদ্রূপ। কেহ আমাদের পরিহিত পোশাক ছিঁড়িয়া ফেলিলে আমরা কষ্ট অনুভব করি। এই কিঞ্চিৎ সম্বন্ধের কারণেই কবরস্থানে পৌঁছিয়া যে সব ছালাম ও দো'আ করা হয়, কবরবাসীরা তাহা শুনে। সাধারণ মু'মিন অপেক্ষা শহীদদের মধ্যে এই সম্পর্ক আরও গাঢ় থাকে। ফলে মৃত্যুর পরও তাহাদের দেহ অক্ষত থাকে। মাটি উহাকে খাইতে পারে না। এই সম্পর্কের ফলেই কোন কোন ওলী মৃত্যুর পরও কার্যক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ইহার অর্থ এই নয় যে, তাহাদের মাযারে যাইয়া মুরাদ চাহিতে হইবে। শরীঅতের দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণ না-জায়েয। হাঁ, তাহাদিগকে উছিলা বানাইয়া দো'আ করায় কোন দোষ নাই। তাহাদিগকে দো'আর ফরমায়েশ করাও জায়েয নহে। কারণ, তাহারা এরূপ দো'আ করার অনুমতি পাইয়াছেন বলিয়া শরীঅতে কোথাও প্রমাণ নাই।

হাদীস দৃষ্টে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, কবরস্থানে পৌঁছিয়া মৃতদের জন্য দো'আ করিবে। আরও জানা যায় যে, জীবিতদের দো'আয় মৃতদের উপকার হইয়া থাকে। তাহারা দো'আর অপেক্ষায় থাকে। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে দো'আ করিতে বলিলে তাহারাও জীবিতদের জন্য দো'আ করিবে, হাদীসে ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ওলীদের তুলনায় নবীদের দেহের সম্বন্ধ আত্মার সহিত আরও বেশী থাকে। ইহারই অন্যতম প্রতিক্রিয়া হিসাবে নবীদের মৃত্যুর পর তাহাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হয় না। তাহাদের বিবিদিগকে বিবাহ করাও অন্যের পক্ষে হারাম। হাদীসে এই মাসআলাটি শুধু হুযূর (দঃ)-এর সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু কোন কোন আলেমের মতে সকল নবীদের ক্ষেত্রেই ইহা সমভাবে প্রযোজ্য। (খোদাই ভাল জানেন।)

www.BANGLAKITAB.com

অতএব, অস্থি চূর্ণ করিলে শারীরিক কষ্ট হয় না। তবে আত্মিক কষ্ট হইতে পারে। এই কারণেই হুযূর (দঃ) বলিয়াছেন যে, মৃতের অস্থি চূর্ণ করা জীবিতের অস্থি চূর্ণ করার মতই।

হযরত উস্তাদ রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি (মাওলানা ইয়াকুব সাহেব) বলিতেন, কেহ তোমার পরিহিত চাদর খুলিয়া তোমার সম্মুখে পোড়াইয়া ফেলিলে তুমি যেরূপ কষ্ট অনুভব করিবে, মৃতের দেহ পোড়াইয়া ফেলিলে তাহার আত্মা তদ্রূপ কষ্ট অনুভব করে। চাদর পোড়াইয়া ফেলিলে আমরা শারীরিক কষ্ট পাই না—শুধু আত্মিক কষ্ট হয়। হাদীসে এই দিক দিয়াই তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

তাছাড়া গোনাহের দিক দিয়া তুলনা দেওয়ারও সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ, জীবিত ব্যক্তির অস্থি চূর্ণ করিলে যেরূপ গোনাহ্ হয়, মৃতের অস্থি চূর্ণ করিলেও তদ্রূপ গোনাহ্ হয়। (আমার মতে এই ব্যাখ্যাটি উত্তম।) উভয় ক্ষেত্রে সমান গোনাহ্ হওয়ার কারণ হইল সম্মান না করা। অস্থি চূর্ণ করিলে ও দেহ পোড়াইয়া ফেলিলে মৃতের প্রতি সম্মান করা হয় না; বরং অসম্মান করা হয়। মোটকথা, মৃত্যুর পরও মৃতের সম্মান করিতে হইবে।

মৃতদিগকে মন্দ বলিতে নাই ঃ এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী উপরোক্ত হাদীসও ইজ্জতের হকের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়া যাইবে এবং এই অর্থ হইবে যে, মৃতব্যক্তি সম্মানের অধিকারী। অস্থি চূর্ণ করিলে সম্মানের হানি হয়, কাজেই অস্থি চূর্ণ করা হারাম। অস্থি চূর্ণ করা অপেক্ষা মন্দ বলা বেশী ক্রিয়াশীল। অতএব, মৃতদিগকে মন্দ বলাও হারাম।

হাদীসে বলা হইয়াছে, মৃতদিগকে মন্দ বলিও না। কারণ, তাহারা বিচারের কাঠগড়ায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাহারা আসলে মন্দ হইলে নিঃসন্দেহে শাস্তি ভোগ করিতেছে। কাজেই তোমার মন্দ বলা অনর্থক বৈ কিছুই নহে। আর যদি তাহারা আসলে ভাল লোক হয়, তবে তুমি মন্দ বলিয়া গোনাহ্‌গার হইবে। কাজেই মৃতদিগকে মন্দ বলা কিছুতেই শোভনীয় নহে। (তবে যাহারা জীবিতাবস্থায় কোন মন্দ প্রথা প্রচলিত করিয়া যায় এবং মৃত্যুর পরও মানুষ ঐ প্রথা পালন করে—তাহাদিগকে মন্দ বলা দূষণীয় নহে। কারণ, ইহাতে মানুষ এ প্রথা পালনে বিরত হইবে।) সুতরাং কথায় বা কাজে কোন প্রকারেই মুসলমান মৃতের মানহানি করা জায়েয নহে। এই মানহানির অনেক প্রকার আছে। তন্মধ্যে একটি বিশেষ প্রকারের মানহানির প্রতি সম্প্রতি জনৈক সুহৃদ বন্ধু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

তাহা এই যে, কিছু সংখ্যক লোক কবরস্থানে পেশাব করে এবং কবরস্থানের জমিনে ঘর উঠাইয়া বসবাস করে। মাসআলাটি একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। ইহা মনোযোগ সহকারে শুনা উচিত। কবরস্থান ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব হইলে কবরের চিহ্ন মিটাইয়া উহাতে ঘর উঠানো জায়েয। কিন্তু যে স্থানে কবরের চিহ্ন আছে, তথায় পায়খানা তৈরী করা কিংবা পেশাব করা হারাম। কবরস্থান ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হইলে উহাকে যে কোন রকমে ব্যবহার করা হারাম। তথায় ঘর নির্মাণ করা জায়েয নহে। আমাদের দেশে অধিকাংশ কবরস্থান ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি। কাজেই এই ধরনের ব্যবহার হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত। ইহাতে আখেরাতের ক্ষতি অর্থাৎ, গোনাহ্ তো আছেই, প্রায়শঃ পার্থিব ক্ষতিও হইয়া থাকে। কোন কোন সময় কবর হইতে এরূপ অপকর্মকারীর প্রতি মরণাঘাত হানা হয়। এ ধরনের অনেক ঘটনাই বর্ণিত আছে। কিন্তু সবই যে সত্য—আমি এরূপ দাবী করি না, তবে অনেক ঘটনা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারাও প্রমাণিত আছে। অতঃপর এসবের প্রতি দৃষ্টি না করিলেও পেশাব-পায়খানা করিলে মৃতব্যক্তিদের যে কষ্ট হয়, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই।

www.BANGLAKITAB.com

খোদার ওলীদের প্রতি সম্মানঃ কবরবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ ওলীও আছেন, যাঁহাদের সম্বন্ধে হাদীসে বলা হইয়াছেঃ مَنْ اٰذٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ অর্থাৎ, যে কেহ আমার কোন ওলীকে কষ্ট দেয়, আমি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দেই। আল্লাহু আকবার! কত কঠোর শাস্তিবাণী! কার সাধ্য যে খোদার যুদ্ধ ঘোষণার মোকাবিলা করে! এই শাস্তিবাণী বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ পায়। কোন সময় খোদা স্বয়ং ওলীদিগকে ব্যাপক কার্যক্ষমতা দান করেন। তাহারা এই ক্ষমতা বলে কষ্টদাতার ক্ষতিসাধন করেন। কখনও ওলী নিজে কোনরূপ ক্ষমতা ব্যবহার করেন না, কিন্তু প্রিয়জনের অসম্মান হইতে দেখিয়া হক তা'আলা স্বয়ং কষ্টদাতাকে কোন বিপদে ফেলিয়া দেন। মোটকথা, খোদার ওলীর সহিত ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যবহার করা মারাত্মক অপরাধ। ওলী স্বয়ং দয়াবশতঃ কিছু না করিলেও খোদার বন্ধুত্বের মর্যাদাবোধ অপরাধীকে রেহাই দেয় না। কাজেই বিষয়টি হইতে খুব বাঁচিয়া থাকা কর্তব্য।

সাধক শীরাযী বলেনঃ

بس تجـربـه كرديم دريں دير مكافات ـــ با دردكشـاں هركه در افتاد بر افتاد

(বস তাজরবা কারদেম দরী দায়রে মুকাফাত + বা দরদ কুশাঁ হর কেহ দর উফ্‌তাদ বর উফ্‌তাদ)

অর্থাৎ, "দান প্রতিদানের অভিজ্ঞতা দুনিয়াতে আমরা এই লাভ করিয়াছি যে, যে খোদা-প্রেমিকদের সহিত অশুভ আচরণে লিপ্ত হইয়াছে, সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

মাওলানা রূমী বলেনঃ

هيـچ قومے را خدا رسـوا نه كرد ـــ تا دل صاحـب دلے نامـد بدرد

(হীচ্‌ কওমে রা খোদা রসওয়া না কর্‌দ + তা দিলে ছাহেবদিলে নামদ বদরদ)

অর্থাৎ, "খোদা কোন জাতিকে ঐ পর্যন্ত লাঞ্ছিত করেন না, যে পর্যন্ত না কোন আল্লাহ্‌ওয়ালার অন্তর ব্যথিত হয়।"

মনে রাখিও, কোন জাতি যদি কোন ওলীকে কষ্ট দেয়, তবে তাঁহার ধৈর্য বিফলে যায় না। কোন না কোন সময় হক তা'আলা তাঁহার পক্ষ হইতে এমন ভয়াবহ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, যাহা স্বয়ং ওলীও কল্পনা করিতে পারেন না। এরূপ মনে করিও না যে, বান্দার হক শুধু জান ও মালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; বরং ইজ্জতও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইজ্জতের হক জান ও মালের হক হইতে অনেক বেশী। কেননা, মৃত্যুর পরও এই হক বাকী থাকে। মৃত্যুর পর কবরের অসম্মান না করা ইহার অন্যতম। বিষয়টি আমি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করিয়া দিলাম। বন্ধুবর কয়েকবারই আমাকে বিষয়টি স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক ওয়াযের মধ্যেই আমি উহা ভুলিয়া যাইতাম। কারণ, ফরমায়েশী আলোচ্য বিষয় খুব কম স্মরণ থাকে। এইবার ভুলি নাই এবং খোদার ফযলে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বর্ণনা হইয়া গিয়াছে।

আমি আরও শুনিয়াছি যে, কোন কোন মোখলেছ লোক কবরস্থানের হেফাযতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছেন। সর্বপ্রকারে তাহাদের সাহায্য ও সহায়তা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে—আপনি বলিয়াছেন যে, কবরস্থানের অসম্মান করিলে বিপদাপদ আসে। কিন্তু আমরা এ যাবৎ কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা করিয়া আসিতেছি, আমাদের উপর তো কোন বিপদাপদ আসিল না। আমরা তো বেশ সবল ও সুস্থ আছি।

www.BANGLAKITAB.com

আমি বলিব, এই প্রশ্নটি কাফেরদের উক্তির ন্যায়। তাহারা নবীদিগকে বলিত, তুমি রোযই আমাদিগকে আযাবের ভয় দেখাইয়া বল যে, কুফরী করিলে এই বিপদ আসিবে, ঐ বালা মুছীবত নাযিল হইবে ইত্যাদি। অথচ আমরা বহু দিন ধরিয়া কুফরী করিতেছি; কিন্তু খোদার আযাব আসিল কই? সুতরাং কাফেরদের এই প্রশ্নের যে পরিণাম হইয়াছিল, উপরোক্ত প্রশ্নকারীদেরও সেই পরিণাম-চিন্তা করা উচিত। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর কোন বিপদ নাযিল হয় নাই সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতেও হইবে না বলিয়া তোমরা খোদার তরফ হইতে কোন ওহী প্রাপ্ত হইয়াছ কি?

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যাহারা এই ধরনের প্রশ্ন করে, তাহারা এখনও বিপদে পতিত আছে। তবে বিপদ দুই প্রকার—প্রকাশ্য ও গুপ্ত। জান ও মালের ক্ষতি হওয়া প্রকাশ্য বিপদ। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ। অপরপক্ষে অন্তর কাল হইয়া যাওয়া গুপ্ত বিপদ। এই বিপদে পতিত হইলে অন্তরে নেক আমল করার যোগ্যতা থাকে না। নেক কাজে মন পিছাইয়া থাকিতে চায়। এই বিপদটি খুবই মারাত্মক। কেননা, অন্তর কাল হইয়া গেলে কোন কোন সময় ঈমানও চলিয়া যায়। ঈমানহীনতার পরিণাম চিরকাল দোযখ ভোগ করা। কাজেই আমি বলি, উপরোক্তরূপ প্রশ্নকারীরা এখনও বিপদমুক্ত নহে। তাহারা গুপ্ত বিপদে পতিত আছে। তাহাদের অন্তর হইতে খোদার ভয় উঠিয়া গিয়াছে। তাই তাহারা খোদার গযবের কথা শুনিয়াও আপন দুষ্কর্ম হইতে বিরত হয় না; বরং উহার প্রতি উল্টা পরিহাস করে। তাহাদের অন্তরে খোদার গযবের ভয় থাকিলে যে কাজে ইহার সন্দেহ হয়, তাহাও অনতিবিলম্বে বর্জন করিত। মাওলানা এই বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

آتشی گر نامدست این دود چیست ـ جاں سیه گشت و رواں مردود چیست

অর্থাৎ, পাপ করিয়াও শাস্তি পাইতেছ না বলিয়া তোমরা যে বলিয়া বেড়াইতেছ, সে সম্বন্ধে মাওলানা বলিতেছেন যে, "তোমাদের ভিতরে গযবের আগুন জ্বলিতেছে। তোমাদের ভিতরে আগুন না জ্বলিলে এই ধোঁয়া কোথা হইতে আসিল?" অর্থাৎ, এইরূপ ধৃষ্টতা ও নির্ভীকতাপূর্ণ উক্তি তোমাদের মুখ হইতে কিরূপে উচ্চারিত হইতেছে? ইহা তোমাদের অন্তর মলিন হইয়া যাওয়ার পরিচয় দিতেছে। ইহা নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য গযব হইতেও বড় গযব।

এ পর্যন্ত বান্দার হক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। এর পর চরিত্রের উল্লেখ করা হইতেছে।

ছবরের স্বরূপ ও প্রকার ঃ وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْس "তাহারা অভাব-অনটন, অসুখ-বিসুখ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ধৈর্য অবলম্বন করে।"

আত্মিক চরিত্রের বহু প্রকার রহিয়াছে। তা সত্ত্বেও হক তা'আলা এখানে শুধু ছবরকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার তিনটি স্থান বর্ণনা করিয়াছেন। নির্দিষ্টভাবে ইহাকে বর্ণনা করার কারণ এই যে, ছবর হাছিল হইয়া গেলে অন্যান্য গুণাবলী আপনাআপনি লাভ হইয়া যায়। কেননা, শুধু আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে স্থিরচিত্ত থাকার নামই ছবর নহে। ইহা ছবরের একটি ক্ষেত্র মাত্র। ছবরের আসল স্বরূপ ইহা হইতেও ব্যাপক। ইহার আভিধানিক অর্থ বিরত রাখা। শরীঅতের পরিভাষায় ইহার অর্থ নফ্‌সকে অপছন্দনীয় কাজকর্ম হইতে বিরত রাখা। অপছন্দের দিক দিয়া শরীঅতের ছবর তিন ভাগে বিভক্ত ঃ (১) ছবর আলাল আমল (২) ছবর ফিল আমল ও (৩) ছবর আনিল আমল।

www.BANGLAKITAB.com

(১) ছবর আলাল আমলের অর্থ হইল নফসকে কোন কাজে আবদ্ধ রাখা এবং উহাতে দৃঢ়তার সহিত কায়েম থাকা। উদাহরণতঃ নামায, রোযা ইত্যাদির পাবন্দী করা এবং নিয়মিত উহা আদায় করা।

(২) ছবর ফিল আমলের অর্থ—আমল করার সময় নফসকে অন্যান্য দিক হইতে বিরত রাখা এবং আপাদমস্তক একাগ্রতা সহকারে কাজ সম্পাদন করা। উদাহরণতঃ নামায অথবা যিকরে মশগুল হওয়ার সময় নফসকে হুশিয়ার করিয়া দেওয়া যে, বাচাধন! এতটুকু সময়ের মধ্যে তুমি নামায অথবা যিকর ব্যতীত অন্য কিছু করিতে পারিবে না। এই সময়ের মধ্যে অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়া অনর্থক কাজ। কাজেই নামায অথবা যিক্‌রের প্রতিই তোমার মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা উচিত। এই ক্ষমতা অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গেলে যাবতীয় আমল ঠিক ঠিক আদায় করা যায়। অনেকেই শরীঅতের ফরয আমলসমূহ পাবন্দীর সহিত সম্পাদন করিতে পারে। কাজেই বলা যায় যে, তাহারা ছবর আলাল আমল লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই আমলগুলি পালন করার সময় তাহারা ইহাদের আদব ও যথার্থতার প্রতি লক্ষ্য রাখে না—বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, তাহারা ছবর ফিল আমল হাছিল করিতে সক্ষম হয় নাই।

(৩) ছবর আনিল আমলের অর্থ—নফসকে শরীঅতের নিষিদ্ধ কার্যাবলী হইতে বিরত রাখা। তন্মধ্যে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ছবর হইল নফসকে কাম-প্রবৃত্তি হইতে ফিরাইয়া রাখা। ইহা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, অন্যান্য আকাঙ্ক্ষা হইতে নফসকে বিরত না রাখিলেও পরে নফস স্বয়ং উহাতে কষ্ট অনুভব করে। কাজেই কষ্ট ভাবিয়া নফস স্বয়ং পরে ঐসব আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত থাকে।

উদাহরণতঃ, ক্রোধ হইতে ছবর করা খুব সহজ। কেননা, ক্রোধের সময় নফস যদিও আনন্দ পায়; কিন্তু পরে খুবই যন্ত্রণা অনুভব করে। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এই যে, ক্রোধের পরেই এক প্রকার অনুশোচনা এই দেখা দেয় যে, অনর্থক কেন রাগ করিলাম—বিষয়টি এড়াইয়া গেলাম না কেন? রাগ করিয়া কেহই আত্মতৃপ্তি পায় না। তাছাড়া কোন কোন সময় অন্যের প্রতি রাগ করিলে তাহার সহিত শত্রুতা জন্মে। ফলে সে ব্যক্তি অনিষ্ট সাধনের চিন্তায় লাগিয়া যায়। এই সব অনিষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মানুষ নিজে নিজেই ক্রোধকে দমন করিতে সচেষ্ট হয়।

কিন্তু কাম-প্রবৃত্তি হইতে ছবর করা যারপরনাই কঠিন। কারণ, কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সময় আনন্দ পাওয়া যায় এবং পরেও ঐ আনন্দ বাকী থাকে। কোনরূপ যন্ত্রণাও দেখা দেয় না। কাহারও হয়ত আত্মিক যন্ত্রণা দেখা দিতে পারে; কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সাধারণ অবস্থায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পর যদিও সাময়িকভাবে কামনা দমিত হইয়া যায়; কিন্তু পরে তাহা আরও বহুগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

পুংমৈথুনঃ ইহা স্ত্রীমৈথুন (যিনা) হইতেও মারাত্মক। আজকাল কিশোরদের সহিত এ সম্পর্ক ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কয়েকটি। প্রথমতঃ, মহিলাদের মধ্যে জন্মগতভাবেই লজ্জা বেশী। কাজেই তাহাদের সহিত কামভাব প্রকাশ করিতে যথেষ্ট সময় লাগে। অপর পক্ষে বালকদের লজ্জা খুব কম।

দ্বিতীয়তঃ, মহিলাদিগকে খুব হেফাযতে রাখা হয়। তাহাদের নিকট পৌঁছা সহজ নহে। কেহ পৌঁছিয়া গেলেও সত্বরই লাঞ্ছিত হইয়া যায়। বালকদের মোটেই হেফাযত করা হয় না। কাহারও কাছে তাহাদের পর্দা নাই।

www.BANGLAKITAB.com

তৃতীয়তঃ, ইহাতে অপবাদের ভয় কম। বালকদের মাথায় স্নেহবশে ও কামবশে উভয় অবস্থায়ই হাত বুলানো যায়। কোন বালককে আদর করিলে সকলেই মনে করিবে যে, লোকটি ছেলেদের প্রতি বেশী স্নেহপরায়ণ। কাম-প্রবৃত্তির খবর কে রাখে?

উপরোক্ত কয়েকটি কারণে আজকাল বালকদের সহিত এই কুকর্ম ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। স্ত্রীমৈথুন অপেক্ষা পুংমৈথুন অধিক জঘন্য। কারণ, স্ত্রীমৈথুন মাহ্‌রাম ব্যক্তির সহিত খুব কম ঘটে। অধিকাংশই মাহ্‌রাম নহে এরূপ ব্যক্তিদের সহিত ঘটিয়া থাকে। ইহা কোন না কোন সময় হালাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কুমারী হইলে সঙ্গেসঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব চলিতে পারে। বিবাহিতা হইলে স্বামী মারা যাওয়ার কিংবা তালাক দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এর পর তাহাকে বিবাহ করা যায়। মোটকথা, স্ত্রীমৈথুনের বেলায় কোন না কোন পর্যায়ে হালাল হওয়ার আশা আছে। যদিও ঐ আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু বালকদের সহিত কুকর্ম কোন অবস্থাতেই হালাল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কতিপয় গোনাহ্ আছে—যাহা জান্নাতে পৌঁছার পর গোনাহ্ থাকিবে না। যেমন, মদ্যপান দুনিয়াতে পাপকাজ, কিন্তু জান্নাতে তাহা পান করার জন্য সরবরাহ করা হইবে। কিন্তু পুংমৈথুন এতই জঘন্য কাজ যে, জান্নাতেও ইহার স্থান নাই। অতএব, ইহা যিনা ও মদ্যপান হইতেও জঘন্য। নেশার কারণে মদ হারাম। কিন্তু কোন উপায়ে মদ হইতে নেশা দূর হইয়া গেলে, যেমন সিরকা হইয়া গেলে উহা পান করা হালাল হইয়া যায়। কিন্তু পুংমৈথুনের জঘন্যতা কোন উপায়েই দূর হইতে পারে না। সুতরাং এই কুকর্ম সবচেয়ে বেশী হারাম। কেননা, ইহা হালাল হওয়ার কোন অবকাশ নাই।

এই অপবিত্র কাজটি সর্বপ্রথম লূত (আঃ)-এর কওমে প্রচলিত হয়। এর পূর্বে মানবজাতির ইতিহাসে ইহার কোন অস্তিত্ব মিলে না। লূত (আঃ) আপন জাতিকে বলিয়াছিলেনঃ

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَآ اَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ

"তোমরা কি এমন সব ব্যভিচারে লিপ্ত আছ, যাহা ইতিপূর্বে জগতের কেহই করে নাই?" কথিত আছে, কোন কোন জন্তুর মধ্যে পূর্ব হইতেই এই কুকর্মের প্রচলন ছিল। হক তা'আলা এই কারণে কওমে লূতের উপর যে আযাব নাযিল করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ইহাতেই বুঝা যায়, কাজটি কত জঘন্য! কারণ, কুফ্‌রী, সকল কাফের জাতির মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান ছিল। তাসত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির উপর বিভিন্ন আযাব তাহাদের বিশেষ বিশেষ কার্যাবলীর জন্যই নাযিল করা হইত। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এই কুকর্মটি স্বয়ং কওমে লূতের আবিষ্কৃত নহে; বরং শয়তান তাহাদিগকে ইহা শিখাইয়াছিল। নফস স্বভাবতঃই মানুষকে মন্দ কাজে উৎসাহিত করে। তা সত্ত্বেও এই কুকর্মটির প্রতি নফস স্বয়ং আকৃষ্ট হয় নাই; বরং খবীস শয়তানই মানুষকে এই দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

পুংমৈথুনের সূচনাঃ কিতাবাদিতে লিখিত আছে যে, শয়তান সুশ্রী বালকের আকৃতি ধারণ করিয়া জনৈক ব্যক্তির বাগান হইতে আঙ্গুর ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইত। বাগানের মালিক তাহাকে প্রায়ই ধমকাইত ও মারধর করিত। কিন্তু সে ইহাতে বিরত হইত না। অবশেষে এক দিন অতিষ্ঠ হইয়া মালিক তাহাকে বলিল, হতভাগা! তুই আমার বাগানের পিছনে পড়িয়াছিস কেন? সবগুলি গাছই যে নষ্ট করিয়া দিলে। তুই আমার কাছ হইতে কিছু টাকা লইয়া যা এবং বাগানের পিছু ছাড়িয়া দে। ইহাতে বালকরূপী শয়তান বলিল, আমি এভাবে বিরত হইব না। যদি আমাকে বাগানের

www.BANGLAKITAB.com

ক্ষতিসাধন হইতে বিরত রাখিতে চাও, তবে আমি যাহা বলি, তাহা কর। মালিক বলিল, তাহা কি? অতঃপর শয়তান তাহাকে এই কুকর্ম শিক্ষা দিয়া বলিল, আমার সহিত এই কুকর্ম কর। তাহা হইলে আমি তোমার বাগান ছাড়িয়া দিব।

সেমতে লোকটি প্রথমবার আপন বাগান রক্ষার খাতিরে অনিচ্ছাকৃতভাবেই এই কুকর্ম করিল। এর পর আর কি? সে উহার মজা পাইয়া বসিল। সে বালককে খোশামোদ করিয়া বলিল, তুই প্রত্যহ আসবি এবং যত ইচ্ছা আঙ্গুর খাইয়া যাইবি। এর পর সে অন্যান্য লোককেও এই কুকর্মের সংবাদ দিল। ফলে তাহারাও ইহাতে লিপ্ত হইয়া গেল। এইভাবে বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়া পড়িল। এর পর শয়তান তো অদৃশ্য হইয়া গেল, কিন্তু কুকর্ম বন্ধ হইল না। তাহারা বালকদের সহিত এই কুকর্ম শুরু করিয়া দেয়। এই কাজটি খোদা তা'আলার অত্যন্ত অপছন্দনীয়। তাই তিনি লূত (আঃ)-কে আদেশ দিলেন, জাতিকে এই কুকর্মে বাধা দান কর। নতুবা ভয়াবহ আযাব আসিবে। লূত (আঃ) জাতিকে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে বুঝাইলেন, কিন্তু কেহই তৎপ্রতি কর্ণপাত করিল না। অবশেষে আযাব নাযিল হইল এবং সকলেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

বন্ধুগণ, এই কুকর্মটি এতই জঘন্য যে, যে ইহাতে লিপ্ত হয়, সেই কুখ্যাত হয়। তাছাড়া ইহাতে আরও একটি অনিষ্ট আছে। তাহা এই যে, কেহ লূতী আখ্যায় আখ্যায়িত হওয়া পছন্দ করে না। অথচ লূতী শব্দের মধ্যে ى অক্ষরটি সম্বন্ধবোধক এবং পয়গম্বর লূত (আঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধ বুঝায়। ইহা মোহাম্মদী, মূসবী, ঈসবী ও ইউসূফী শব্দের ন্যায়। লূত (আঃ)-এর কওম যদি এই কুকর্ম না করিত, তবে আজ লূতী শব্দটিও মোহাম্মদী ও ইউসুফী শব্দের ন্যায় গৌরবজনক থাকিত। কিন্তু এই হতভাগা কওম আপন নবীর নামকেও ছাড়িল না।

লেওয়াতাত (পুংমৈথুন) শব্দের অপপ্রয়োগ ঃ বন্ধুগণ, এই কুকর্ম বুঝাইবার জন্য 'লেওয়াতাত' শব্দটি ব্যবহার করা আমার কাছে খুবই অপছন্দনীয়। কেননা, লেওয়াতাত শব্দটির উৎপত্তি লূত (আঃ)-এর নাম হইতে। সুতরাং এমন নোংরা কাজের নাম একজন পয়গম্বরের নাম হইতে লওয়া খুবই অশোভনীয়। এই শব্দটি সর্বপ্রথম যে প্রয়োগ করিয়াছে, সে ঘোর অবিচার করিয়াছে। আমার মতে ইহা মূল আরবী শব্দ নহে; বরং অন্য ভাষা হইতে ইহা আরবীতে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। বিশুদ্ধভাষী আরবদের উক্তিতে কোথাও ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না। আরবীতে এই অর্থ বুঝাইবার জন্য اِتْيَانٌ فِى الدُّبُرِ শব্দ আছে বলিয়া জানা যায়। অথবা অন্য কোন শব্দও থাকিতে পারে। ফলকথা, লেওয়াতাত শব্দটি বর্জন করার যোগ্য। আমার মতে ইগ্‌লাম اِغْلَامْ (সমমৈথুন) শব্দটি মূল আরবী নহে। মূল আরবীতে ইহার ব্যবহার নাই। এসবগুলি পরবর্তী কালের আবিষ্কৃত।

মোটকথা, এই কার্যের জঘন্যতা যুক্তি, কোরআন, হাদীস ইত্যাদি সবকিছু দ্বারা প্রমাণিত। সুস্থস্বভাব লোক আপনাআপনিই ইহাকে ঘৃণা করে। বদস্বভাব লোক ছাড়া কেহই এই কুকর্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে না। পুংমৈথুন ও স্ত্রীমৈথুনের মধ্যে একটি প্রকাশ্য পার্থক্য এই যে, মহিলাদের সহিত মৈথুনের পর উভয়ের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। মহিলাটির দৃষ্টিতে পুরুষটির সম্মান বাড়িয়া যায়। সে তাহাকে পুরুষ মনে করে—কাপুরুষ মনে করে না। কিন্তু বালকের সহিত মৈথুন করার পরমুহূর্তেই একে অপরের দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া যায়। অতঃপর সত্বরই বালকের মনে এমন শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়া উঠে যে, সে প্রতিপক্ষের চেহারা দেখাও পছন্দ করে না।

www.BANGLAKITAB.com

দৃষ্টি-রোগঃ অনেকেই পুংমৈথুন দোষ হইতে মুক্ত হইলেও দৃষ্টি-রোগে আক্রান্ত রহিয়াছে। কেননা, হাদীস দৃষ্টে জানা যায় যে, চক্ষু দ্বারাও যিনা হয়। অতএব, কিশোর বালকদিগকে কামপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখাও হারাম। খুব কম সংখ্যক লোকই এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে। দৃষ্টি কুকর্মের ভূমিকা। ফেকাহ্‌শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী হারাম কাজের ভূমিকাও হারাম। সুতরাং দৃষ্টির হেফাযত করাও অত্যন্ত জরুরী।

কোন কোন বুযুর্গ বলেন, খোদা যাহাকে আপন দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিতে চান, তাহাকে বালকদের মহব্বতে লিপ্ত করিয়া দেন। মহব্বত ইচ্ছাধীন ব্যাপার নহে সত্য; কিন্তু উহার উপায়াদি অর্থাৎ, তাহাদিগকে দেখা ও তাহাদের সহিত মেলামেশা করা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কাজেই উপরোক্ত উক্তির অর্থ এই যে, হক তা'আলা যাহাকে দরবার হইতে বিতাড়িত করিতে চান, সে বালকদের প্রতি কু-দৃষ্টি করে ও তাহাদের সহিত মেলামেশা করার কাজে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এইগুলি ইচ্ছাধীন কাজ। ইহার ফলে মহব্বত সৃষ্টি হইয়া যায় এবং পরিণামে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি খোদার দরবার হইতে বহিষ্কৃত হয়। (খোদা আমাদের হেফাযত করুন।)

তাছাড়া বালকদের সাথে এশ্‌ক হওয়ার গোটা ব্যাপারটি আমার বুঝে আসে না। আজকাল লোকেরা ফেস্‌কের (পাপাচারের) নাম রাখিয়াছে এশ্‌ক। মাওলানা বলেনঃ

عشق هائے کز پائے رنگے بود ــ عشق نبود عاقبت ننگے بود

(এশ্‌কহায়ে কিয পায়ে রঙ্গে বুয়াদ + এশ্‌ক নাবুয়াদ আকেবাত নঙ্গে বুয়াদ)

"রূপরঙ্গের মোহে যে এশ্‌ক হয়, তাহা আসলে এশ্‌ক নহে; বরং উহার পরিণাম লাঞ্ছিত হওয়া ছাড়া কিছুই নহে।" অপর একজন বলেনঃ

ایں نہ عشق است آنکہ در مردم بود ــ ایں فساد خوردن گندم بود

(ঈঁ না এশ্‌ক আস্ত আঁকেহ দর মরদুম বুয়াদ + ঈঁ ফসাদে খুরদানে গন্দম বুয়াদ)

"মানুষের মধ্যে প্রচলিত এশ্‌ক আসলে এশ্‌ক নহে; বরং ইহা গন্দম খাওয়ার অশুভ পরিণতি।"

যদি হাজারের মধ্য হইতে কোন একজন প্রকৃত এশ্‌কে পতিত হইয়া যায়, তবে তাহাকে এশ্‌কের কারণে তিরস্কার করা হইবে না। তবে পরবর্তী পর্যায়ে সে যে সমস্ত কাণ্ডকীর্তি করিবে, তজ্জন্য তাহাকে ধিকৃত করা হইবে। কেননা, উহা ইচ্ছাধীন কাজ। এমন কি মনে মনে বালকের কল্পনা করিয়া স্বাদ উপভোগ করাও ইচ্ছাধীন কাজ। ইহা ত্যাগ করা ওয়াজিব। অভিজ্ঞতার আলোতে দেখা গিয়াছে যে, এমতাবস্থায় প্রিয়জন হইতে দূরে সরিয়া থাকা খুবই উপকারী। ইহাতে প্রায়ই এই রোগটি দুর্বল হইয়া পড়ে। 'তাকাশ্‌শুফ' নামক কিতাবে আমি ইহার যে চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, উহা দ্বারাও অনেকে উপকার পাইয়াছে। সুতরাং উহাও আমলে রাখা দরকার। এই ব্যাপারে বিশেষতঃ খোদার পথের পথিকদিগকে এবং ব্যাপকভাবে সমস্ত মুসলিমদিগকে অত্যধিক সতর্ক থাকা উচিত।

আমাদের এলাকায় একজন যাকের ছিলেন। একদা যিকরের সময় তিনি অনুভব করিলেন যে, নিম্নোক্ত আয়াতখানি যেন তাঁহার অন্তরে উপস্থিত হইয়া গ্রথিত হইয়াছেঃ

اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

"আমি এই বস্তিবাসীদের উপর তাহাদের কুকর্মের দরুন ভীষণ আযাব নাযিল করিব।"

www.BANGLAKITAB.com

বলা বাহুল্য, ইহা খোদার তরফ হইতে এলহাম (খোদা প্রদত্ত স্বর্গীয় প্রেরণা) ছিল এবং 'হাতেফ' (অদৃশ্য স্থান হইতে আহ্বানকারী ফেরেশতা) মারফত তাঁহার অন্তরে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইহার অর্থ এই বুঝিলেন যে, তিনি যে বস্তিতে বসবাস করেন, উহার উপর খোদার আযাব নাযিল হইবে এবং তাহা হইবে প্লেগ রোগ। কোন কোন হাদীসে প্লেগ রোগকেই রিজ্‌য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যেহেতু এই আয়াতখানি কওমে লূত সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছিল, এই কারণে তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, এই আযাবের কারণ হইল কওমে লূতের কুকর্ম। তাঁহার বস্তির লোকগণ তখন এই কুকর্মে ব্যাপকভাবে লিপ্ত ছিল।

অতঃপর এক জুমুআর নামাযে তিনি উপস্থিত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, কওমে লূতের কুকর্ম ব্যাপকহারে প্রচলিত হওয়ার দরুন এই বস্তির উপর আযাব নাযিল হইবে এবং তাহা হইবে প্লেগ রোগ। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত এই কুকর্ম ত্যাগ করিয়া খোদার দরবারে তওবা ও এস্তেগফার করা। কিন্তু এই হীন কুকর্মের ফলে মানুষের অন্তর এতই কাল হইয়া যায় যে, উহাতে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্যতাও থাকে না। তাই সকলে তাঁহার কথায় টিট্‌কারী আরম্ভ করিয়া দিল। 'সোবহানাল্লাহ্! আজকাল তিনি ওহী পাইতে শুরু করিয়াছেন।' উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে তাহারা উল্টা খুব ঠাট্টা করিতে লাগিল। অবশেষে অল্পদিনের মধ্যেই তথায় এমন ভয়াবহরূপে প্লেগ দেখা দিল যে, বাড়ীর পর বাড়ী জনশূন্য হইয়া গেল।

মনে রাখুন, এই কুকর্মের ফলে প্রকাশ্য আযাব ছাড়া গুপ্ত আযাবও নাযিল হয় অর্থাৎ, অন্তর বিকৃত হইয়া যায়। খোদা সকল মুসলমানকে ইহা হইতে নিরাপদে রাখুন। আমীন!

খোদা পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টাঃ সুতরাং কাম-প্রবৃত্তি হইতে ছবর করা ক্রোধ হইতে ছবর করা অপেক্ষা কঠিন। এই কারণে কামরোগে ব্যাপকভাবে লোক আক্রান্ত। কিন্তু যতক্ষণ আপনি উহা হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা না করেন, ততক্ষণ ইহা কঠিন। আপনি যেদিন হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা আরম্ভ করিবেন, সেদিন হইতেই ইহা সহজ হইয়া যাইবে। কারণ, উহা আপনার পক্ষে কঠিন, খোদার পক্ষে কঠিন নহে। আপনি ইচ্ছা করিয়া দেখুন—খোদা সত্বরই উহা সহজ করিয়া দিবেন। মাওলানা বলেনঃ

تو مگو ما را بداں شہ بار نیست ــ بر کریماں کارہا دشوار نیست

(তূ মগু মারা বদাঁ শাহ্ বার নীস্ত + বর করীমাঁ কারহা দুশ্‌ওয়ার নীস্ত)

'অর্থাৎ, তুমি এই কথা বলিও না যে, আমি খোদার দরবারে পৌঁছিতে পারি না। কেননা, পৌঁছা তোমার এখ্‌তিয়ারভুক্ত নহে; বরং তাহা খোদার এখ্‌তিয়ারে। তিনি দয়ালু। স্বীয় করুণায় তিনি নিজেই তোমাকে পৌঁছাইয়া দিবেন। কারণ, দয়ালু ব্যক্তিদের কাছে কোন বড় কাজই কঠিন নহে। সুতরাং আমরা উপযুক্ত না হইলেও আমাদিগকে আপন দরবারে পৌঁছানো খোদার পক্ষে মোটেই কঠিন নহে। অতএব, নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। আপন চেষ্টায় পৌঁছা বাস্তবিকই মুশ্‌কিল। কিন্তু চেষ্টার পরই খোদা সাহায্য করেন। তুমি ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে তিনি পৌঁছাইয়া দিবেন এবং জটিলতা সহজ করিয়া দিবেন।

এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, চেষ্টা করিলে খোদা পৌঁছাইয়া দেন সত্য; কিন্তু তজ্জন্য তো চেষ্টারও দরকার। অথচ আমরা চেষ্টা করি না বা যাহা করি তাহাও নিছক অসম্পূর্ণ। কাজেই হক তা'আলা আমাদিগকে পৌঁছাইবেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা বলেনঃ

www.BANGLAKITAB.com

هم بایں دلها نماید خویش را ــ هم بدوزد خرقهٔ درویش را

(হাম বঈঁ দিলহা নুমায়াদ খেশ রা + হাম বদুযাদ খেরকায়ে দরবেশ রা)

এখানে خرقهٔ درویش বলিয়া সাধকের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ, খোদা এমনি দয়ালু যে, তোমাদের অসম্পূর্ণ চেষ্টাকেও তিনি নিজেই সম্পূর্ণ করিয়া দেন। তোমাদের ছিন্ন বস্ত্রকে নিজেই সেলাই করিয়া দেন এবং সাধকদের অন্তরে আপন জ্যোতিঃ বিকিরণ করেন। দয়াবশতঃ না হইলে আমাদের অন্তর কিছুতেই হক তা'আলার জ্যোতিঃ লাভের যোগ্য নহে। কিন্তু তুমি যে অবস্থাতেই খোদার সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা কর, তোমার চেষ্টা অসম্পূর্ণ হইলেও তিনি আপন রহমতে উহা সম্পূর্ণ করিয়া দেন। তোমার অন্তরকে আপন জ্যোতিঃ বিকিরণের যোগ্য করিয়া তারপর উহাতে জ্যোতিঃ বিকিরণ করেন। তখন আয়না তালাশ করারও প্রয়োজন হয় না। তিনি নিজেই ডাকিয়া আয়না দান করেন যে, লও উহাতে আমার সৌন্দর্য অবলোকন কর। সোবহানাল্লাহ্, কি দয়া! সুতরাং এখন আর কোন প্রশ্ন থাকিতে পারে না। এখন আপনার চেষ্টা ও সন্ধানে কোন বাধাও নাই।

সুতরাং আপনি সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ ইত্যাদি চিন্তা বাদ দিয়া চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিন। অসম্পূর্ণ চেষ্টাও সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। হাদীসে কুদ্সীতে বলা হইয়াছেঃ

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَیَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَیْهِ ذِرَاعًا وَّمَنْ تَقَرَّبَ اِلَیَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَیْهِ بَاعًا وَّمَنْ اَتَانِیْ یَمْشِیْ اَتَیْتُ اِلَیْهِ هَرْوَلَةً اَوْ کَمَا قَالَ

"যে আমার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দুই হাত প্রসারিত পরিমাণ অগ্রসর হই এবং যে আমার দিকে হাঁটিয়া আসে, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।"

এই হাদীসে অর্ধ হাত, এক হাত ইত্যাদি শুধু বুঝাইবার জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়াছে। আসল অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি আমার দিকে সামান্য মনোযোগ দেয়, আমি তাহার দিকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মনোযোগ দেই।

সত্যই হক তা'আলার এইরূপ মনোযোগ ও দয়া না হইলে বান্দার সাধ্য কি যে, তাঁহার দরবার পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে? খোদার সহিত মানুষের সম্পর্কই বা কি? তিনি তো মানুষ হইতে বহু ঊর্ধ্বে। বান্দার কল্পনাও সে পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। যিনি এত মহান ও ঊর্ধ্বে, তাঁহার পরিচয়, মহব্বত ও মোশাহাদা (প্রত্যক্ষকরণ) মানুষ কিরূপে লাভ করিতে পারে? মানুষ তাঁহার যে পরিচয় পায়, তাহা একমাত্র তাঁহারই অনুগ্রহে। নতুবা তাঁহার দূরত্ব এইরূপঃ

نه گردد قطع هرگز جادهٔ عشق از دویدنها

که می بالد بخود ایں راه چوں تاك از بریدنها

(নাগরদাদ কাতা হরগিয জাদায়ে এশ্ক আয দবীদানহা
কেহ মীবালাদ বখুদ ঈঁ রাহ্ চুঁ তাক আয বোরীদানহা)

"এশ্কের এই দূরত্ব দৌড়িয়া অতিক্রম করা সম্ভব নহে। কেননা, আঙ্গুরের বৃক্ষ কাটিয়া দিলে যেমন বাড়ে তেমনি এশ্কের ঐ রাস্তা আপনাআপনিই বাড়িয়া যায়।"

www.BANGLAKITAB.com

সীমাহীন দূরত্ব, যাহা অতিক্রম করা মানুষের সাধ্যাতীত, তাহা কিরূপে অতিক্রম করা যাইবে? শুনুন।

خود بخود آں شہ ابرار ببرمی آید ــ نہ بزور و نہ بزاری نہ بزر می آید

(খোদবখোদ আঁ শাহে আবরার বর মীআয়াদ + না বযোর ও না বযারী না বযর মীআয়াদ)

"এই শাহানশাহ্ নিজেই চলিয়া আসেন। জোরে, কান্নাকাটিতে ও টাকা পয়সার প্রভাবে তিনি আসেন না।"

খোদা পর্যন্ত পৌঁছার উপায়ঃ প্রথমতঃ, সাধক ও মাহ্‌বূবের মধ্যে সীমাহীন দূরত্ব থাকে, যাহা সাধকের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। কিন্তু সাধক যখন চলিতে আরম্ভ করে, তখন হক তা'আলা তাহার দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দয়া প্রদর্শন করেন। ফলে তিনি নিজেও চলিতে আরম্ভ করেন। হক তা'আলার পক্ষে এই দূরত্ব অতিক্রম করা মোটেই কঠিন নহে। তিনি নিজেই সাধকের নিকট পৌঁছিয়া যান এবং এইভাবে মিলন হইয়া যায়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বান্দা পৌঁছে না, হক তা'আলা স্বয়ং বান্দার নিকট পৌঁছেন। কিন্তু কি অপার করুণা! এতদ্‌সত্ত্বেও বান্দাকে 'ওয়াছেল' (পৌঁছানেওয়ালা) উপাধি দান করা হইয়াছে।

বান্দার পৌঁছার স্বরূপ সম্বন্ধে আমি একটি উদাহরণ মনোনীত করিয়াছি। তাহা এই যে, মনে করুন, আপনার একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু আপনার নিকট হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছে। আপনি তাহাকে বলিতেছেন যে, দৌড়াইয়া চলিয়া আস। অথচ আপনি জানেন যে, এই কচি শিশুর পক্ষে এই দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নহে—এখন শিশু সাহস করিয়া দুই এক পা অগ্রসর হয়, আর পড়িয়া যায় এবং কাঁদিতে থাকে। এমতাবস্থায় পিতা স্বয়ং জোশে আসিয়া যাইবে এবং সে নিজেই দৌড়াইয়া শিশুর নিকট পৌঁছিবে এবং তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবে। এখানে দেখুন, যে দূরত্ব সাক্ষাৎলাভে বাধা হইয়া রহিয়াছিল, তাহা কিরূপে অতিক্রান্ত হইয়া গেল!

খোদার পথ অতিক্রমের বেলায়ও ঠিক তদ্রূপ হইয়া থাকে। প্রথমে তুমি অসম্পূর্ণ চেষ্টা ও স্পৃহা প্রকাশ কর। তোমার এই চেষ্টা খোদা পর্যন্ত পৌঁছার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নহে, কিন্তু দুই এক পা চলার পর পড়িয়া যাইতেই হক তা'আলার দয়ার সমুদ্র উথলিয়া উঠে। তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া লন। তবে হাঁ, শিশুর ন্যায় এক পা দুই পা অগ্রসর হইয়া অবশ্য কান্নাকাটি আরম্ভ করারও প্রয়োজন আছে। মাওলানা বলেনঃ

هر کجا پستی ست آب آنجا رود ــ هر کجا مشکل جواب آنجا رود

هر کجا دردے دوا آنجا رود ــ هر کجا رنجے شفا آنجا رود

گرنه گرید طفل کے جوشد لبن ــ گرنه گرید ابر کے خندد چمن

"যেখানে নিম্নভূমি, পানি সেখানেই যায়। যেখানে সমস্যা সেখানেই সমাধান। যেখানে ব্যথা, সেখানেই ঔষধ। যেখানে রোগ, সেখানেই রোগমুক্তি। শিশু কান্নাকাটি না করিলে দুধে জোশ মারিবে কিরূপে এবং মেঘমালা ক্রন্দন না করিলে বাগান কিরূপে হাসিবে?" কাঁদা ও পড়িয়া যাওয়ার অর্থ এই নহে যে, সজোরে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দাও। সাধকের কাঁদা ও পড়িয়া যাওয়ার অর্থ হইল, আপন অক্ষমতাকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করা, হক তা'আলার সম্মুখে কাকুতি মিনতি করা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা এবং অহংকার ও ফেরআউনী মনোভাব

www.BANGLAKITAB.com

মস্তিষ্ক হইতে মুছিয়া ফেলা। এর পর খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে দেরী লাগে না। তুমি চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দেখ।

মাওলানা বলেনঃ

سالها تو سنگ بودی دلخراش ـ آزمون را یك زمانه خاك باش
در بهاراں کے شود سر سبز سنگ ـ خاك شو تا گل بروید رنگ برنگ

(সালহা তু সঙ্গ বূদী দিল খারাশ + আযমুঁরা এক যমানা খাক বাশ
দর বাহারাঁ কায় শাওয়াদ সর সব্য সঙ্গ + খাক শো তা গোল বরুয়াদ রঙ্গ বরঙ্গ)

'তুমি বহু বৎসর নির্মম পাথর হইয়া রহিয়াছ। এখন পরীক্ষামূলকভাবে কিছু দিনের জন্য মাটি হইয়া দেখ; বসন্তকালে পাথর কিরূপে শস্যশ্যামলা হইবে? মাটি হও, তাহা হইলে উহা হইতে নানা রঙ্গের ফুল উৎপন্ন হইবে।'

খোদার দড়িঃ আমি খোদা পর্যন্ত পৌঁছার উদাহরণস্বরূপ দুগ্ধপোষ্য শিশুর অবস্থা উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে জনৈক বাদশাহের গল্প মনে পড়িয়া গেল। এক বুযুর্গের মুখে এই গল্পটি শুনিয়াছি। জনৈক বাদশাহ্ বালাখানায় উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় নীচে পথের মধ্যে জনৈক দরবেশকে পথ চলিতে দেখিয়া ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার নিকট আসুন; আপনার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আছে।' দরবেশ উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমি কিরূপে আসিব? আপনি বালাখানায় বসিয়া আছেন, আর আমি বহু নীচে, মহলের দরজাও আমা হইতে অনেক দূরে।' শাহী মহলের দরজা বাস্তবিকই তথা হইতে অনেক দূরে ছিল। বাদশাহ্র বালাখানা পর্যন্ত পৌঁছিতে অনেক দরজা ও সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হইত। বাদশাহ্ তৎক্ষণাৎ একটি দড়ি লটকাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ইহা শক্ত করিয়া ধরুন।' দরবেশ দড়ি ধরিলে বাদশাহ্ টান দিয়া দুই মিনিটের মধ্যেই তাহাকে উপরে উঠাইয়া লইলেন। উপরে পৌঁছার পর বাদশাহ্ দরবেশকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি খোদা পর্যন্ত পৌঁছিলেন কিরূপে?" দরবেশ উত্তর দিলেন, 'যেভাবে আপনার নিকট পৌঁছিয়াছি।' খোদা পর্যন্ত পৌঁছা আসলে খুবই কঠিন ছিল; কিন্তু আমি তাঁহার দড়ি খুব শক্ত করিয়া ধরায় তিনি নিজেই আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। সোবহানাল্লাহ্! কি চমৎকার জওয়াব!

বন্ধুগণ! যদি তোমরাও খোদার দড়ি শক্ত ধরিতে, তবে তাঁহার আকর্ষণে তোমরাও তথায় পৌঁছিয়া যাইতে। পরিতাপের বিষয়, মানুষ খোদার দড়িকে কাটিয়া দিতেছে। পয়গম্বরগণ হইলেন খোদার দড়ি। তাঁহারা মানুষকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। পয়গম্বরগণের পর হক্কানী আলেম ও আওলিয়া পয়দা হইয়াছেন। তাঁহারাও সর্বদা মুসলমানদিগকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা দেখান এবং উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শনের কাজে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা খোদার মহব্বত ও মা'রেফাতের ফযীলত এবং আত্মার সংশোধনের উপায় বর্ণনা করিতেছেন। এতদ্সত্ত্বেও মানুষ এদিকে কর্ণপাত করে না। তাহারা পূর্ববৎ অন্যমনস্কতায় ডুবিয়া রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কেহ তাহাদিগকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইতে চাহিলে চতুর্দিক হইতে তাহার উপর বিদ্রূপ ও তিরস্কারের বান বর্ষিত হইতে থাকে। শুধু এই কারণে যে, যেসব কাজকর্ম খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে বাধা সৃষ্টি করে, আলেমগণ তাহা করিতে নিষেধ করেন। বলিতে কি, খোদার দড়ি কাটার অর্থ ইহাই। তুমি নিজেই যখন পৌঁছিতে চাও না, তখন খোদার কি ঠেকা পড়িল যে, তিনি খোশামোদ করিয়া পৌঁছাইবেনঃ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ "তোমরা হেদায়ত পছন্দ না করিলেও কি আমি উহা জবরদস্তি তোমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিব?"

www.BANGLAKITAB.com

কাম-প্রবৃত্তির প্রকারভেদঃ মোটকথা, কাম-প্রবৃত্তি হইতে ছবর করা স্বয়ং কঠিন হইলেও মানুষ ছবরের ইচ্ছা করিয়া ফেলিতেই তাহা সহজ হইতে থাকে। এর পর উহা আর কঠিন থাকে না।

আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। কাম-প্রবৃত্তি শুধু মহিলা ও কিশোর বালকদের সহিত সম্পর্ক রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; বরং সুস্বাদু খাদ্যের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকা, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদের ফিকিরে মগ্ন থাকা এবং সদাসর্বদা গল্পগুজবে মাতিয়া থাকার অভ্যাসও কাম-প্রবৃত্তি। এই সমস্ত হইতে নফস্‌কে বিরত রাখাও কাম-প্রবৃত্তি হইতে ছবর করার মধ্যে গণ্য।

আজকাল মানুষের মধ্যে গল্পগুজবে মাতিয়া থাকার রোগটি খুব ব্যাপকাকারে দেখা দিয়াছে। একটু অবসর পাইলেই তাহারা আড্ডা জমাইয়া অনর্থক গল্পগুজবে মাতিয়া উঠে। আমি শুধু সাধারণের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করিতেছি না; বরং ওলামা ও মাশায়েখকেও গল্পের বৈঠক বসাইতে নিষেধ করিতেছি। কারণ, এই রোগটি তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কোন কোন পীর সাহেবের বাড়ীতে এশার পরও আসর জমে। ইহাতে অনর্থক ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। তাহাতে শায়খের কার্যক্রমে যদি ব্যাঘাত না-ও ঘটে, তবুও বৈঠকের সকলেই সমান নহে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ফজরের নামাযও গায়েব করিয়া বসে। তাছাড়া বিনা প্রয়োজনে গল্পগুজব করাতে অন্তরও অন্ধকার হইয়া যায়। সুতরাং অন্য ক্ষতি না হইলেও ইহাও কি কম ক্ষতি? বিশেষতঃ খোশামোদী মুরীদের রচিত শায়খের প্রশংসাসূচক আলাপ-আলোচনা হইলে তাহাতে প্রশংসিত ব্যক্তির সর্বনাশ ঘটে। মাওলানা বলেনঃ

تن قفس شکل ست وزاں خار جاں ـ از فریب داخلاں و خارجاں
اینش گوید من شوم ہمراز تو ـ آنش گوید نے منم انباز تو
او چو بیند خلق را شد مست خویش ـ از تکبر میرود از دست خویش

"দেহ পিঞ্জরের ন্যায়। এই কারণেই ইহা আত্মার জন্য কন্টকস্বরূপ। (কাঁটা যেমন বাগানে পৌঁছার জন্য প্রতিবন্ধক, তদ্রূপ খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে দেহ আত্মার জন্য প্রতিবন্ধক।) যাতায়াতকারীদের চাটুকারিতার কারণে এই প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়াছে। একজন বলেন, আমি তোমার ভেদের সাথী। অন্যজন বলে, আমি তোমার ন্যায় অবস্থাবিশিষ্ট। এইভাবে সে যখন বহু লোককে তাহার গুণগান করিতে দেখে, তখন অহঙ্কারে ডুবিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলে।"

একটি ব্যাপক চরিত্রগুণঃ উপরোক্ত আলোচনায় আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ছবর একটি ব্যাপক চরিত্রগুণ। দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ শুধু বিপদের সময় কান্নাকাটি না করাকেই ছবর মনে করে। অথচ কাম-প্রবৃত্তি ও ক্রোধকে দমন করাও ছবর। বালক, নারী, খাদ্য, পোশাক, গল্পগুজব ইত্যাদি সম্পর্কিত কামনাও কাম-প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ যাবতীয় গোনাহ্ হইতে নফ্‌সকে বিরত রাখা এবং সকল প্রকার এবাদতের পাবন্দি করাও ছবরের মধ্যে গণ্য। এবাদত পালন করার সময় উহার হক ও আদব স্থিরতা ও ধীরতাসহ প্রতিপালন করাও এক প্রকার ছবর। সুতরাং ইহা এমন ব্যাপক একটি গুণ—যাহাতে অনেকগুলি চরিত্র অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই কারণেই হাদীসে বলা হইয়াছেঃ اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ "ছবর অর্ধেক ঈমান" এবং এই কারণেই হক তা'আলা এখানে যাবতীয় চরিত্রের মধ্য হইতে শুধু ছবরের উল্লেখ করিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

এখন বোধ হয় আপনাদের বুঝিতে বাকী নাই যে, উপরোক্ত আয়াতে ধর্মের যাবতীয় অঙ্গই সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এর পর ছবরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান বর্ণনা করিয়াছেনঃ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ অর্থাৎ, তাহারা ছবর করে, بأساء ضراء بأس -এর বেলায়। তফসীরকারগণ বলিয়াছেন যে, بأساء শব্দ দ্বারা অভাব অনটন, ضراء শব্দ দ্বারা অসুখ-বিসুখ এবং بأس শব্দ দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহ বুঝান হইয়াছে। কিন্তু শব্দের ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাও বলা যায় যে, অভাব অনটনে ছবর করার সারমর্ম হইল, খোদার দিকে দৃষ্টি রাখা, অন্যের ধনদৌলতের প্রতি লালসার দৃষ্টি না করা এবং অন্যের কাছ হইতে কোনকিছু আশা না করা। সুতরাং এই প্রসঙ্গে 'কানা'আত' (অল্পেতুষ্টি) ও 'তাওয়াক্কুল' (খোদার উপর ভরসা রাখা) এই দুইটি বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তদ্রূপ ضراء শব্দ দ্বারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যে কোন অসুখ-বিসুখ বুঝান হইয়াছে। বাহ্যিক অসুখে ছবর করার অর্থ মানুষের সম্মুখে হা হুতাশ না করা এবং অন্তরে খোদার প্রতি কোনরূপ মলিন ভাব না রাখা। সুতরাং ইহাতে 'তাসলীম' (খোদার নিকট আত্মসমর্পণ করা) ও 'রেযা' (খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা)—এই দুইটি বিষয়েও শিক্ষা নিহিত আছে। আভ্যন্তরীণ অসুখে ছবর করার অর্থ আভ্যন্তরীণ রোগসমূহের চাহিদার সম্মুখে নতি স্বীকার না করা এবং সাহসিকতার সহিত উহার মোকাবিলা করা। উদাহরণতঃ কাহারও মধ্যে নারী কিংবা বালকদের প্রতি কাম-প্রবৃত্তি রোগ থাকিলে তাহার উচিত হইবে এই প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা এবং সাহসিকতার সহিত নারী ও বালকদের তরফ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখা এবং তাহাদের সহিত মেলামেশা না করা। তদ্রূপ কৃপণতার রোগ থাকিলে তাহার উচিত হইবে তদনুযায়ী আমল না করা এবং মনের উপর জোর দিয়া খোদার পথে ধনদৌলত দান করিয়া দেওয়া। অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রেও এইরূপ মনে করিতে হইবে।

بأس শব্দ দ্বারাও যে কোন পেরেশানী ও হয়রানী বুঝান হইয়াছে বলা যায়। এমতাবস্থায় ইহা ছবরের বিশেষ বিশেষ স্থান উল্লেখের পর অবশেষে ব্যাপক স্থান উল্লেখের মধ্যে পরিগণিত হইবে। অর্থাৎ, অভাব-অনটন এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অসুখ-বিসুখেও সাহসিকতা দেখাইবে। তাছাড়া যে কোন পেরেশানী আপতিত হউক, উহাতেও স্থিরচিত্ত থাকিবে। এই ব্যাপক স্থানসমূহের মধ্যে একটি হইল যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ছবর করা। জেহাদের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অটল অনড় হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব, ছবরের সারমর্ম হইল এই যে, পূর্ণরূপে মুওয়াহ্হেদ (মু'মিন) হইতে হইবে। এরূপ লোকের শান নিম্নরূপঃ

موحد چه بر پائے ریزی زرش ـ چه فولاد هندی نهی بر سرش
امید و هراسش نباشد ز کس ـ همین است بنیاد توحید و بس

"তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তির পায়ে স্বর্ণরৌপ্য স্তূপীকৃত করিলে বা তাহার মাথার উপর হিন্দী তলোয়ার রাখিলেও (হানিলে) সে তাহাতে মোটেই প্রভাবান্বিত হয় না। সে কাহারও নিকট কিছু আশা করে না এবং কাহাকেও ভয় করিয়া চলে না। ইহাই তওহীদের মূল ভিত্তি।"

ছবরের স্থানগুলি পূর্ণরূপে আমলে আসিয়া গেলে তওহীদ পূর্ণরূপ ধারণ করে। ধর্মের এই অঙ্গসমূহ বর্ণনা করার পর এখন ইহাদের ফল স্বরূপ বলিতেছেন, أُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ "তাহারাই সত্যবাদী এবং তাহারাই মোত্তাকী।" এই বাক্যটি মোহরস্বরূপ। সমস্ত বিষয় বর্ণনা করার পর যেন অবশেষে মোহর মারিয়া দিলেন যে, তাহারাই সত্যবাদী ও মোত্তাকী।

www.BANGLAKITAB.com

পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী জানা গিয়াছে যে, এই আয়াতে ধর্মের যাবতীয় অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ বলায় পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, 'ছাদেক' ও মোত্তাকী পূর্ণ ধার্মিক ব্যক্তিকেই বলে এবং তাকওয়া ও ছিদ্‌ক পূর্ণ ধার্মিকতারই অপর নাম। প্রথমোক্ত আয়াত সম্বন্ধে আমি দাবী করিয়াছিলাম যে, اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ "খোদাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হইয়া যাও।" এর অর্থ হইতেছে اكْمِلُوا فِي الدِّينِ وَكُونُوا مَعَ الْكَامِلِينَ "ধর্মে পূর্ণতা অর্জন কর এবং পূর্ণ ধার্মিকদের সঙ্গী হইয়া যাও।" উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই দাবী সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন হইতেই এই দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেল। (যে তফসীরের সমর্থন কোরআনের অন্যান্য আয়াত হইতে পাওয়া যায়, তাহা যে সর্বোৎকৃষ্ট, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।)

কামেল হওয়ার উপায়ঃ আয়াতের অর্থ হইল, "হে মুসলমানগণ! ধর্মে কামেল হইয়া যাও।" অতঃপর হক তা'আলা ইহার উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন। উহা হইল কামেল ধার্মিকদের সঙ্গী হইয়া যাও। বন্ধুগণ, খোদার কসম, হক তা'আলার বর্ণিত এই উপায়টি কোন সাধক বা বিচক্ষণ ব্যক্তি কস্মিনকালেও ব্যক্ত করিতে পারিবে না। কামেলদের সঙ্গলাভ দ্বারাই যে কামেল হওয়া যায় ইহা কেহ বুঝিতে পারিত না। কিন্তু ইহার অর্থ ইহাই নহে যে, শুধু কামেলদের সঙ্গ লাভ করাই বুযুর্গী ও কামালত হাছেলের জন্য যথেষ্ট। কেননা, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া শুধু কামেলদের সঙ্গে দিন অতিবাহিত করিলে এবং নিজে কিছুই না করিলে কেহ কামেল হইতে পারিবে না; বরং ধর্মে কামেল হওয়ার আসল উপায় হইল আমলে পূর্ণতা অর্জন করা। ইহা এবাদত পালন করিলে এবং গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিলে অর্জিত হয়। তাই لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا الخ আয়াতে এই সমস্ত আমলকেই 'যথেষ্ট নেকী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি বর্ণনা করার পরই যাহারা উহা আমলে আনে তাহাদিগকে মোত্তাকী ও ছাদেক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যদ্দ্বারা আমলের উপরই কামালত নির্ভরশীল হওয়া স্পষ্ট হইয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হইল, আমলে কামেল হওয়ার উপায় কি? কেননা, আমলে পূর্ণতা অর্জনের পথে একটি বাধা আছে, তাহা হইল নফ্‌স। প্রত্যেক আমলের মধ্যেই ইহার এক একটি কামনা বাধা হইয়া দাঁড়ায়। শরীঅত আদেশ করে, শীতকালেও পাঁচ ওয়াক্তেই ওযূ কর, কিন্তু নফ্‌সের আরামপ্রিয়তা ইহাতে বাধা দেয়। শরীঅতের নির্দেশ হইল—প্রতি বৎসর যাকাত আদায় কর। কিন্তু নফ্‌সের কার্পণ্য ইহাতে প্রতিবন্ধক সাজে। শরীঅত বলে, ঘুষ ও সুদ গ্রহণ করিও না, কিন্তু নফ্‌সের লোভ ইহাতে বাধা দেয়। শরীঅত নির্দেশ দেয়, বালক ও বেগানা মহিলাদিগকে কু-দৃষ্টিতে দেখিও না, কিন্তু নফসের কাম-প্রবৃত্তি ইহাতে ঘোর আপত্তি জানায়। তদ্রূপ শরীঅতের নির্দেশ আছে, অভাব-অনটনে অন্যের ধনদৌলতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না। কিন্তু লোভ এই নির্দেশের প্রতি কর্ণপাতও করিতে দেয় না। এইরূপে শরীঅতের প্রত্যেকটি আমলের মোকাবেলায় নফ্‌সের একটি না একটি আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। উহা শরীঅতের আদেশ পালনে বাধা দান করে। খোদা তা'আলা পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জন করার আদেশ দান করিয়া আমল সঞ্চয় করাকে উহার উপায় বলিয়া দিয়াছেন।

নফসের আকাঙ্ক্ষা দমন করাঃ কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, প্রত্যেক আমল করার সময় নফসের যে অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া বাধার সৃষ্টি করে, উহার প্রতিকার কি? হক তা'আলা

www.BANGLAKITAB.com

كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ বলিয়া ইহার প্রতিকারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দিয়াছেন। ইহার সারমর্ম এই যে, কামেল ব্যক্তিদের সংসর্গের মধ্যেই এই গুণ নিহিত আছে যে, উহা বাহ্যিক ও আন্তরিক আমলসমূহকে পূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে যাবতীয় বাধা দূর করিতে পারে। অর্থাৎ, ইহার ফলে নফ্সের আকাঙ্ক্ষা তেমন প্রবল থাকে না। যাহা থাকে, তাহার মোকাবিলা করা খুব সহজ হইয়া যায়। ফলে আমলে পূর্ণতা অর্জন সহজে সম্পন্ন হইতে পারে।

দেখুন, এই প্রতিকার কত সহজ! যেন কানাকড়ি দামের ব্যবস্থাপত্র। কিন্তু উপকার হাজার টাকার। ইহাকে লতা-পাতার চিকিৎসাও বলিতে পারেন, যাহাতে এক পয়সাও খরচ হয় না। অতএব, এই আয়াতে পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জনের যে উপায় বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ইহা আসল উপায় নহে; বরং আসল উপায়ের মধ্যে যে সব বাধা ছিল—উহা দূরীকরণের পন্থা। তবে যেহেতু বাধা দূরীকরণ ব্যতীত আসল উপায়টি খুবই কঠিন—এই জন্য ইহাকেই পূর্ণতা অর্জনের আসল উপায় বলিয়া দিলে অত্যুক্তি হইবে না; নফসের আকাঙ্ক্ষা দুর্বল করার যে উপায় এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, খোদার কসম, তদপেক্ষা সহজ ও সরল উপায় আর কেহ বর্ণনা করিতে পারিবে না। শাস্ত্রবিদগণ নফসকে সংশোধিত করার নিমিত্ত না জানি কত শত উপায় নির্ধারিত করিয়াছেন। উহাদের আমল করা সাহসী লোকদের কাজ। কিন্তু এই উপায়টিকে আমলে আনা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে কঠিন নহে। ইহা কোরআনের নিরেট দাবীই নহে; বরং চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কামেল ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে নফসের আকাঙ্ক্ষা দুর্বল হইয়া পড়ে।

সাধারণ ওলী ও বিশেষ ওলীর পার্থক্য ঃ যাঁহারা কামেল ধার্মিক, তাহাদের কথা বাদ দিয়াও আমি বলি যে, সাধারণ মু'মিনদের সমাবেশে উপস্থিত হইয়া দেখ। যখন সকলেই নামাযের প্রতি ধাবিত হয়, তখন বেনামাযীর অন্তরেও নামায পড়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। কেন জাগিবে না? সাধারণ মু'মিনগণও তো খোদার ওলী। কেননা, বেলায়েত দুই প্রকার। একটি সাধারণ বেলায়েত অপরটি বিশিষ্ট। যে কোন মুসলমান সাধারণ ওলীর শ্রেণীভুক্ত। এই কারণে সাধারণ মু'মিনদের সংসর্গেও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়, তবে শুধু বদমায়েশ ধরনের লোক একত্রিত না হওয়া চাই; বরং সাধারণ জনসমাবেশ হওয়া চাই। তাহা হইলেই তাহাদের সংসর্গ ক্রিয়াশীল হইবে। ইহা শুনিয়া কেহ যেন গর্ব না করে যে, যখন সাধারণ মুসলমানও ওলী তখন আমাদের অন্য ওলীর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কি? কেন আমরা অন্যের কাছে যাইব? আমি বলি, তবুও যাওয়ার প্রয়োজন আছে। কেননা, সাধারণ ওলীগণ খোদার যে বন্ধুত্ব লাভ করেন, তাহা বিদ্রোহী ও শত্রুদের মোকাবিলায় বাদশাহ্র সহিত সাধারণ প্রজাদের বন্ধুত্বের ন্যায়। বিদ্রোহী ও শত্রুদের প্রতি লক্ষ্য করিলে সাধারণ প্রজাদিগকে বাদশাহ্র বন্ধু ও অনুগত বলা যায়। ইহার অর্থ এই যে, তাহারা বিদ্রোহী ও শত্রু নহে। কিন্তু ইহাকেই যথেষ্ট মনে করা হয় না। এই ধরনের বন্ধুত্বের ফলে সাধারণ প্রজাগণ বাদশাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে? কখনও নহে। কেননা, কোন কোন প্রজাকে চুরি ও বদমায়েশীর কারণে কয়েদখানায়ও বন্দী করা হয়। তথায় দৈনিক তাহাদের পিঠে একশত বেত্রাঘাত করা হয়। এই অবস্থায়ও এই ব্যক্তি বিদ্রোহীর প্রতি লক্ষ্য করিলে বাদশাহ্র অনুগত প্রজা বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। যাহার ফলে কখনও তাহাকে শাহী করুণায় মুক্তিও দেওয়া হয়। কিন্তু বিদ্রোহী এই ধরনের অনুগ্রহের যোগ্য নহে। অতএব, বিশেষ শ্রেণীর ওলী না হইয়া শুধু সাধারণ শ্রেণীর ওলী হইলে সে বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় জেলে আবদ্ধ কয়েদীর ন্যায় হইবে। বাদশাহ্র সহিত তাহার সম্পর্ক থাকে বটে, কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই সম্পর্ককে

www.BANGLAKITAB.com

যথেষ্ট মনে করিতে পারে না। বুদ্ধিমান মাত্রই বিশেষ সম্পর্ক অর্জনের জন্য চেষ্টিত থাকে। তাই আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, প্রত্যেক উদ্দেশ্যের বেলায় পূর্ণতা অর্জনই লক্ষ্য থাকে। তবে সাধারণ মু'মিনদের সংসর্গের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করার মূলে আমার উদ্দেশ্য এই যে, যখন অপূর্ণ লোকদের সংসর্গেরই এই প্রতিক্রিয়া, তখন কামেলদের সংসর্গের কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে নিজেই বুঝিয়া লও।

جرعه خاك آميز چوں مجنوں كند ـ صاف گر باشد ندانم چوں كند

'এক গ্রাস মাটি মিশ্রিত মদই যদি এমন নেশাগ্রস্ত করিতে পারে; তবে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ মদে না জানি কি পরিমাণ নেশা হয়?' পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লউন, অতিরিক্ত ঘুমের কারণে যাহার রাত্রি বেলায় চক্ষু উন্মীলিত হয় না, সে কিছুদিন এমন লোকদের সহিত বসবাস করুক—যাহারা রাত্রে জাগ্রত হইয়া নামায পড়ে। খোদা চাহে তো তাহারও তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস হইয়া যাইবে। তদ্রূপ খোদার যিকরের সহিত যাহার সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, কিছুদিন যিকরকারীদের দলে উঠাবসা করিলে সত্বরই যিকরের সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যাইবে। কেননা, তাহাদের দলে থাকিলে আপনাআপনিই অন্তরে যিকরের আকাঙ্ক্ষা জাগিবে। এইরূপে প্রথম দিন হইতেই তাহার মনে যে যিকর বিরোধী আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা দুর্বল হইতে থাকিবে। অতএব, কামেলদের সংসর্গে থাকিলে কি পরিমাণ উপকার হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহেঃ

آهن كه بپارس آشنا شد ـ فى الحال بصورت طلا شد

'পরশ পাথর নামে একটি প্রসিদ্ধ পাথর আছে। উহাতে লোহা ছোঁয়াইয়া দিলেও নাকি খাঁটি স্বর্ণে রূপান্তরিত হইয়া যায়।' কামেলদের সংসর্গেও তদ্রূপ ফল লাভ হয়।

কামেলদের সংসর্গের শর্তঃ কিন্তু কামেল ব্যক্তিদের সংসর্গ প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য একটি শর্ত ও একটি সংযম রহিয়াছে। সংযম এই যে, কাজকর্ম ইত্যাদিতে কামেল ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। শর্ত হইল আপন সমুদয় অবস্থা তাঁহাকে জানাইতে থাকিবে। তোমার অন্তরে যে-কোন রোগ থাকুক, তাহা পরিষ্কার তাঁহাকে জানাইয়া দিতে কোনরূপ লজ্জা করিবে না। কেননা, চিকিৎসকের সম্মুখে চিকিৎসার খাতিরে গুপ্ত অঙ্গ খোলা জায়েয। তদ্রূপ আত্মার চিকিৎসকের সম্মুখে নফ্‌সের রোগ বর্ণনা করিয়া দেওয়াও জায়েয। কাজেই একবার তাঁহার সম্মুখে স্বীয় ভাল-মন্দ সব খুলিয়া ধর। তাঁহার দৃষ্টিতে তুমি ঘৃণিত হইয়া যাইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিও না। ওলীদের দৃষ্টিতে তাঁহাদের নিজেদের ন্যায় ঘৃণিত আর কেহ নহে। তাঁহারা নিজকে এত হেয় মনে করেন যে, ফাসেক ও পাপাচারী ব্যক্তিও নিজকে এত হেয় মনে করিতে পারে না। আপন অবস্থা বর্ণনা করার পর তিনি যাহা করিতে বলিবেন, তাহা করিবে। বাহ্যিক রোগের চিকিৎসার বেলায়ও তুমি এরূপ কর। প্রথমে ডাক্তারকে স্বীয় অবস্থা জানাও। এর পর ডাক্তার যে ব্যবস্থাপত্র দেয়, উহা ব্যবহার কর। যদি ডাক্তার কিছু সংযমও বলিয়া দেয়, তুমি তাহা পালন কর। বলাবাহুল্য, কামেল ব্যক্তিদের সংসর্গে পৌঁছিয়াও এই উপায় অবলম্বন করা উচিত।

যদি কেহ শুধু সাক্ষাতের নিয়তে প্রত্যহ ডাক্তারের নিকট গমন করে; স্বীয় অবস্থা তাহাকে না জানায় এবং ব্যবস্থাপত্রও না লয়, তবে এই রোগী রোগ হইতে মুক্তি পাইতে পারে কি? কখনই নহে। তদ্রূপ শুধু যিয়ারত ও মোলাকাতের নিয়তে কামেল ব্যক্তিদের সংসর্গে গমন করিলে আন্তরিক রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নহে। অবশ্য তাহাদের যিয়ারতেও ছওয়াব

www.BANGLAKITAB.com

পাওয়া যায় ইহা ভিন্ন কথা, কিন্তু এখানে ছওয়াব পাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে না। ছওয়াবের জন্য অন্যান্য আরও বহু কাজ রহিয়াছে। এখানে পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জনের কথা হইতেছে। সুতরাং আমার বর্ণিত উপায়েই একমাত্র কামেলদের নিকট হইতে পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জন করা সম্ভব। এই উপায়টি সর্বদা মনে রাখিবে। যখনই কোন কামেল বুযুর্গের সংসর্গে যাও কিংবা পত্র লিখ, তখন এই সংকল্প কর যে, নফ্সের যাবতীয় রোগ তাঁহাকে জানাইয়া দিবে এবং তিনি যাহা করিতে বলেন, তাহা কার্যে পরিণত করিবে। সুতরাং কামেল আওলিয়াদের সংসর্গে থাকিলেও আমল তোমাকেই করিতে হইবে। আমল না করিয়া কামেল হইয়া যাইবে, ইহা হইতে পারে না।

কামেলদের সংসর্গের প্রতিক্রিয়া ঃ তবে পার্থক্য এতটুকু যে, প্রথমে তুমি আমল করার ইচ্ছা করিলে নফ্স উহার বিরোধিতা করিত। কিন্তু কামেলদের সঙ্গে থাকিলে অধিকতর সৎকাজের আকাঙ্ক্ষা জাগিবে এবং বিরুদ্ধাচারী আকাঙ্ক্ষা দমিত হইয়া যাইবে। ফলে প্রথমে যে কাজ করা কঠিন ছিল, আজ তাহা শুধু সহজই হইবে না; বরং উহা না করিলে মনে শান্তি আসিবে না। ইহা কি কম উপকার?

বন্ধুগণ, নিঃসন্দেহে ইহা বড় উপকার। ইহাকে সামান্য মনে করিও না। কামেলদের সংসর্গে গেলেই ইহা লাভ হয়, দূরে থাকিলে লাভ হয় না। কামেলদের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়াও মোত্তাকী হওয়া যায়; কিন্তু তাহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। পক্ষান্তরে যাহারা তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক রাখে, তাহারা খুব সহজেই তাকওয়া লাভ করিতে পারে। আমল সহজ হওয়া কামেলদের সংসর্গের একটি ক্ষুদ্রতম প্রতিক্রিয়া মাত্র। ইহার পর জ্ঞানের আলো, মা'রেফাত, হাল ইত্যাদির নিরাপত্তা, গুপ্ত বিষয়সমূহে উন্নতি ইত্যাদি আরও কত বিষয়ে যে লাভ হয়, তাহার তো কোন ইয়ত্তাই নাই।

উদ্ধৃত আয়াত হইতে এই বিষয়টি বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি ইহা বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। আমি ইহা কোন নূতন বিষয় বর্ণনা করিতেছি না; বরং খোদার নেয়ামত প্রকাশার্থে বলিতেছি যে, আমি এখানে কোন নূতন বিষয় বর্ণনা না করিলেও ইহাতে খোদা পর্যন্ত পৌঁছার উপায় বলিয়া দিয়াছি। পক্ষান্তরে আমি সকলকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছি। কেননা, সহজ উপায় বলিয়া দেওয়া পৌঁছাইয়া দেওয়ারই নামান্তর। আমার বর্ণিত এই সহজ উপায়টি হয়তো ইতিপূর্বে আপনি শুনেন নাই। এখনও যদি অগ্রসর না হন এবং খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে চেষ্টা না করেন, তবে খোদার তরফ হইতে আপনাদিগকে জানাইবার দায়িত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে।

'ছিদক'-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ঃ এখন এই আয়াত সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া আমি বক্তব্য শেষ করিতে চাই। পূর্বেও সংক্ষেপে বলিয়াছি, 'ছিদ্‌ক' অর্থ শুধু মুখে সত্য কথা বলা নহে। যাহাতে কেহ ইহা না মনে করে যে, ছিদ্‌ককে পূর্ণ ধার্মিকতা বলা হইয়াছে, উহা তো আমরা লাভ করিয়াই আছি, কেননা, আমরা সত্য কথা বলি। আসলে ছিদ্‌ক অর্থ পূর্ণতা। এই কারণেই কামেল ওলীকে 'ছিদ্দীক' বলা হইয়া থাকে। কারণ, তিনি যাবতীয় অবস্থা, কথা ও কর্মে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। শরীঅতের পরিভাষায় ছিদ্‌ক—কথা, কর্ম, অবস্থা এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

কথার ছিদক মানে—কথা নিশ্চিত ও বাস্তব হওয়া এবং অনিশ্চিত ও বাস্তব বিরোধী না হওয়া। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে 'ছাদেকুল আক্‌ওয়াল' (সত্যভাষী) বলা হয়।

www.BANGLAKITAB.com

কাজের ছিদ্‌ক হইল—প্রত্যেক কাজ শরীঅতের নির্দেশ অনুযায়ী হওয়া এবং উহার বিপক্ষে না হওয়া। সুতরাং যাহার কাজ সর্বদা শরীঅতসম্মত হয়, তাহাকে 'ছাদেকুল আফআল' (সত্য কর্মী) বলা হয়।

হালের ছিদ্‌ক হইল—প্রত্যেক হাল সুন্নত অনুযায়ী হওয়া। সুতরাং যে সব হাল সুন্নতের বিরোধী, সেগুলি মিথ্যা হাল। যাহার হাল সর্বদা সুন্নত মোতাবেক হয়, তাহাকে 'ছাদেকুল আহওয়াল' (সত্য হালবিশিষ্ট) বলা হয়।

যে হালের প্রতিক্রিয়া স্থায়ী হয় এবং আজ আছে, কাল নাই—এরূপ না হয়—উহাকেও সত্য হাল বলে। কোন কোন লোকের হাল বাকী থাকে না। মাঝে মাঝে সে নিজের মধ্যে ভয় অথবা তাওয়াক্কুলের প্রাধান্য অনুভব করে; কিন্তু পরক্ষণেই উহার কোন প্রতিক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে না। এরূপ ব্যক্তিকে সত্য হাল বিশিষ্ট বলা হইবে না। হাল স্থায়ী হওয়া উদ্দেশ্য নহে; বরং হালের প্রতিক্রিয়া স্থায়ী হইতে হইবে। মোটকথা, শরীঅতের পরিভাষায় 'ছিদক' শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। অথচ সাধারণতঃ ইহাকে কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা হয়। ফলে মানুষ নানাবিধ ভ্রান্তিতে লিপ্ত হইয়া যায়।

শরীঅতের পরিভাষাঃ ইহাকে ইমাম গায্‌যালী (রঃ) এইরূপে লিখিয়াছেন, শরীঅতের পরিভাষায় পরিবর্তন সাধন করাও মানুষের মনগড়া কার্যাবলীর অন্যতম। সাধারণ লোকদের মতে—কান্‌য ও হেদায়া (দুইটি কিতাবের নাম) পড়িয়া লওয়াই ফেকাহ্‌। অথচ শরীঅতে কিতাব পড়িয়া লওয়াকে ফেকাহ্‌ বলে না। ফেকাহ্‌ একটি বিশেষ জ্ঞান—যাহাতে শরীঅতের আহ্‌কাম বুঝার বিশেষ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এইরূপ ব্যক্তিকে ফকীহ বলিতেন, যিনি আহকাম বুঝার সঙ্গে সঙ্গে আমলেও কামেল হইতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল ফেকাহ্‌র জন্য আমলকে জরুরী মনে করা হয় না। এছাড়া শরীঅতের আরও বহু পারিভাষিক শব্দের অর্থে পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে।

উদাহরণতঃ, শরীঅতে এল্‌ম বলা হয় শুধু কোরআন ও হাদীস সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে। কিন্তু আজকাল অনেকেই ইহাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে। নাস্তিকতাবাদীরা এই রোগে বেশী আক্রান্ত। তাহারা বিজ্ঞান ও ভূগোলকেও এল্‌মের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করাও তাহাদের মতে এল্‌ম। আমি কিছু সংখ্যক রচনা দেখিয়াছি—উহাতে হাদীস দ্বারা এল্‌মের ফযীলত বর্ণনা করত ইংরেজী শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা দলীলস্বরূপ اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْكَانَ بِالصِّيْنِ হাদীসটিকেও উল্লেখ করিয়াছে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হাদীসে যে এল্‌মের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে—ইংরেজী শিক্ষাও উহার অন্তর্ভুক্ত (নাঊযুবিল্লাহ্‌) অথচ ইহা সম্পূর্ণ ভুল। শরীঅতে যে স্থানে এল্‌মের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে কিংবা তৎপ্রতি উৎসাহ বা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তথায় শরীঅতে একমাত্র কোরআন হাদীস ইত্যাদিকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কথা যে, এইগুলির শিক্ষা আরও কয়েকটি শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে। এই হিসাবে ঐগুলিও ওয়াজিব হইবে। কিন্তু ভূগোল ও বিজ্ঞান কোন পর্যায়েই আসে না। কোন যুক্তি দ্বারাই এইগুলিকে শরীঅতের এল্‌ম বলা যায় না। সুতরাং হাদীসের সাহায্যে এইগুলি শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দেওয়া বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে। খুব কম সংখ্যক লোকই এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করে। ছিদ্‌ক-এর পারিভাষিক অর্থেও এইভাবে পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাকে শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ শরীঅতে ইহা কথা, কাজ ও হাল—এই সবগুলির মধ্যেই পরিব্যাপ্ত।

www.BANGLAKITAB.com

তাকওয়ার ফযীলতঃ আরেকটি কথা রহিয়া গেল। তাহা এই যে, তাকওয়া ও ছিদ্‌ক উভয়টি যখন পূর্ণ ধার্মিকতা, তখন আয়াতে তাকওয়াকে পূর্বে ও ছিদ্‌ককে পরে উল্লেখ করা হইল কেন? আয়াতের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা এইভাবে বলিলেও হাছিল হইয়া যাইতঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْدُقُوْا وَكُوْنُوْا مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ইহার অর্থও পূর্বের অর্থের ন্যায় যে, হে মুসলমানগণ! পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জন কর এবং কামেল ব্যক্তিদের সঙ্গী হইয়া যাও। সুতরাং তাকওয়া পূর্বে উল্লিখিত হওয়ার অন্তর্নিহিত রহস্য কি?

এই প্রশ্নটি এই মুহূর্তে আমার মনে উদয় হইয়াছে, যাহা পূর্বে মনে ছিল না। খোদার ফযলে ইহার উত্তরও এখনই মনে জাগিয়াছে। এখানে তাহাই বর্ণনা করিতেছি। ইহা অপেক্ষা উত্তম জওয়াব কাহারও জানা থাকিলে তাহা বলিয়া দিবেন। আমার মতে এইরূপ পূর্বাপর উল্লেখ করার রহস্য এই যে, তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে, কোরআনের আয়াত দৃষ্টেই তাহা জানা যায়। কিন্তু ছিদ্‌কের এরূপ বিভিন্ন স্তর নাই। উহার একটি মাত্র নির্দিষ্ট স্তর আছে। ইহার দলীল এই আয়াতঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

এই আয়াতের শানে-নুযূল এই যে, হক তা'আলা মুসলমানদের উপর শরাব পান হারাম করিলে পর কোন কোন ছাহাবীর মনে এই সন্দেহ জন্মে যে, আমাদের মধ্যে যাহারা শরাব হারাম হওয়ার পূর্বে উহা পান করিত এবং এখন দুনিয়াতে বাঁচিয়া নাই, তাহারা বোধ হয় গোনাহ্‌গার হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন তাহারা পান করিত, তখন শরাব হারাম ছিল না। কাজেই তাহারা হারাম কাজ করে নাই। এমতাবস্থায় ছাহাবীদের মনে এইরূপ সন্দেহ হওয়ার তাৎপর্য কি? উত্তর এই যে, তাঁহারাও ইহা জানিতেন, কিন্তু তাসত্ত্বেও সম্ভবতঃ তাঁহাদের মনে সন্দেহ ছিল যে, ঐ সময় শরাব হালাল ছিল বলিয়াই হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয় নাই; কিংবা তখনও শরাব হারাম ছিল, কিন্তু আমরা ইহাতে খুব বেশী অভ্যস্ত ছিলাম বলিয়া হঠাৎ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল করা হয় নাই। কারণ, তাহা হইলে আমরা তদনুযায়ী আমল করিতে পারিতাম না। পরে আমাদের মধ্যে আস্তে আস্তে আমল করার যোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করা হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় যাহারা হারাম হওয়ার পূর্বে শরাব পান করিয়াছে, তাহারা হালাল বস্তুই পান করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় তাহারা হারাম পান করিয়াছে। তবে এ সম্বন্ধে আয়াত নাযিল না হওয়ায় তাহারা গোনাহ্‌গার হয় নাই। তবুও বাস্তবক্ষেত্রে হারাম বস্তু পান করা অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগের কারণে তাহাদের মর্তবা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতে হক তা'আলা ছাহাবীদের এই সন্দেহ নিরসন কল্পে বলেনঃ মুসলমানগণ (এ যাবৎ) যাহা পান করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের কোন গোনাহ্ নাই (অর্থাৎ, হারামের নির্দেশ আসার পূর্বে যাহারা শরাব পান করিয়াছে, তাহারা গোনাহ্‌গার হয় নাই।) যদি তাহারা অন্যান্য গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং ঈমানদার থাকে, নেক আমল করিয়া থাকে, অতঃপর তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়া থাকে এবং ঈমানদার থাকে, আবার তাকওয়া অবলম্বন করিয়া থাকে এবং আন্তরিকতার সহিত কাজ করিয়া থাকে। আর আল্লাহ্ তা'আলা এখ্‌লাছ অবলম্বনকারী-দিগকে খুব ভালবাসেন।

www.BANGLAKITAB.com

এখানে আসল বক্তব্য এই যে, হারাম হওয়ার পূর্বে যাহারা শরাব পান করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ হয় নাই। কিন্তুঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا *

আয়াত দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, তাহাদের কোন প্রকার গোনাহ্ নাই। এই জন্য পরে ব্যাপক নীতি হিসাবে কতকগুলি শর্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এই শর্তগুলি বিদ্যমান থাকিলে যে কোন প্রকার গোনাহ্ হয় নাই বলাতো শুদ্ধ হইতে পারে। কেননা, যদি কেহ হারাম হওয়ার পূর্বে শরাব পান করিয়া থাকে এবং যিনা ব্যভিচার করিয়া থাকে, তবে শরাবের কারণে গোনাহ্ হয় নাই বলা তো শুদ্ধ, কিন্তু তাহার কোন প্রকার গোনাহ্ হয় নাই বলা শুদ্ধ নহে। অতএব, আয়াতের সারমর্ম হইল—তাহারা অন্যান্য গোনাহ্‌র কাজ যাহা তখন হারাম ছিল, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিলে এবং নির্দেশিত সৎকার্য সম্পাদন করিয়া থাকিলে শুধু শরাব পানের কারণে তাহাদের কোন গোনাহ্ নাই।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, এই আয়াতে তিনবার তাকওয়া ও ঈমানের উল্লেখ করা হইল কেন? একবার মু'মিন বলার পর যখন তাহাদিগকে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত প্রকাশ করা হইল, এর পরও اٰمنوا واتقوا বলার তাৎপর্য কি? ঈমানের পরও ঈমান আনা এবং তাকওয়ার পরও তাকওয়া অবলম্বন করা কেমন? ঈমানকে বারবার উল্লেখ করার উত্তর এই যে, ঈমানের বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। তন্মধ্যে এক স্তর হইল কুফর ও শির্ক হইতে তওবা করা। ঈমান শুদ্ধ হওয়ার জন্য এই স্তরটি শর্ত। ইহা ছাড়া কোন নেক আমলই কবূল হয় না। ঈমানের আরেকটি স্তর যাহা নেক আমল হইতে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল হইয়া যাওয়া এবং ইহার উপর দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা অর্জিত হওয়া। দ্বিতীয়বার اٰمنوا বলিয়া এই স্তরটির প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

সারকথা এই যে, একবার ঈমান আনিয়া তাহারা নেক আমল করিতে থাকে এবং নিষিদ্ধ কাজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে থাকে, ফলে তাহাদের অন্তরে ঈমানের দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। এর পর তাহারা যেরূপ আমল করে, ঈমানও তদ্রূপ উৎপন্ন হয়। সর্বদা নেক আমল করিতে থাকিলে প্রত্যেকের ঈমানেই স্থিতিশীলতা ও দৃঢ়তা লাভ হয়। তবে যে ব্যক্তির আমল অসম্পূর্ণ তাহার ঈমানও অসম্পূর্ণ হয় এবং যাহার আমল কামেল তাহার ঈমানও কামেল হয়।

তৃতীয়বার ঈমানের উল্লেখ করিয়া এদিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ঈমানের উপর স্থায়ী হইয়া যাওয়ার পর আমল অনুযায়ী তাহাদের ঈমানের উন্নতি লাভ হইতে থাকে। এর পর ঈমানের উল্লেখ করে নাই; বরং এহ্‌সানের উল্লেখ করিয়াছেন। শরীঅতের পরিভাষায় ইহার অর্থ এখলাছ (খাঁটি করা)। ইহা ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। ইহাকে ছিদ্‌কও বলা হয়। এখলাছবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ছিদ্দীক বলা হয়। অর্থাৎ, ঈমানের পর আমলে উন্নতি হইলে এহ্‌সানের স্তরে উন্নীত করা হয়। ঈমানের মধ্যে এই স্তরটিই কাম্য। যে ব্যক্তি এই স্তরে উন্নীত হইতে পারে, সে খোদার মাহ্‌বূব (প্রিয়পাত্র) হইয়া যায়। এর পর সে আযাব ও গোনাহ্‌র বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। কেননা, প্রিয়জনকে কেহই শাস্তি দেয় না। ঈমানের বারবার উল্লেখ সম্বন্ধে এই জওয়াব বর্ণিত হইল।

তাকওয়ার বিভিন্ন স্তরঃ তাকওয়ার বারবার উল্লেখ করার জওয়াবও উপরোক্ত জওয়াবের অনুরূপ। তাকওয়ারও বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। কুফর ও শির্ক হইতে বাঁচিয়া থাকা এক প্রকার

www.BANGLAKITAB.com

তাকওয়া। নেক আমল ত্যাগ না করা, নিষিদ্ধ কার্যে লিপ্ত না হওয়া এক প্রকার তাকওয়া। এর পর আমল যত ভাল হইবে, তাকওয়াও তত ভাল হইতে থাকিবে। এইরূপে তাকওয়া কামেল হইয়া গেলে ঈমানও কামেল হইয়া যাইবে। এর পর এহ্সান তথা এখলাছের স্তর হাছিল হইবে। ইহা যেরূপ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর তদ্রূপ তাকওয়ারও সর্বোচ্চ স্তর, ইহাই আসল লক্ষ্য। সুতরাং আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। ছিদ্কেরও এরূপ বিভিন্ন স্তর আছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ছিদকের একটি মাত্র স্তর আছে এবং তাহাই চূড়ান্ত ও সুনির্দিষ্ট স্তর। অর্থাৎ, এহ্সানকেই শরীঅতে ছিদ্ক ও এখলাছ বলা হয়।

এখন জানা দরকার যে, হক তা'আলা যদি আয়াতে প্রথমে ছিদ্ক ও পরে তাকওয়ার উল্লেখ করিতেন, তবে শ্রোতাদের মনে বিরাট বোঝার চাপ পড়িয়া যাইত। তাহারা বুঝিত যে, আমাদিগকে প্রথম দিনেই কামেল হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অথচ ইহা খুবই কঠিন ব্যাপার। এই কারণে প্রথমে ছিদ্কের উল্লেখ না করিয়া তাকওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিভিন্ন স্তর থাকায় এইরূপ বুঝিবার অবকাশ নাই যে, প্রথম দিনেই কামেল হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; বরং শ্রোতাগণ বুঝিবে যে, তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর থাকার কারণে ক্রমে ক্রমে সমস্ত স্তর অর্জন করিয়া ছিদ্কের স্তরে পৌঁছিয়া যাইতে বলা হইয়াছে। ছিদ্কের স্তরে পৌঁছিতে পারিলেই কামেল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। ইহার উপায় হইল বাহ্যতঃ তাঁহাদের সঙ্গলাভ করা। ইহাতে অন্তরের দিক দিয়াও তাঁহাদের ন্যায় হইয়া যাইতে পারিবে।

فَاتَّقُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ 'সাধ্যানুযায়ী খোদাকে ভয় কর' এই আয়াতের শানে-নুযূল হইতেও বুঝা যায় যে, তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, প্রথমে فَاتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ 'খোদাকে যেরূপ ভয় করা দরকার, তদ্রূপ ভয় কর' আয়াতখানি নাযিল হইয়াছিল। ইহাতে ছাহাবাগণ চিন্তিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, অদ্যই যথাযথ তাকওয়া অবলম্বন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। অথচ প্রথম পর্যায়ে এইরূপ তাকওয়া হাছিল করা খুবই কঠিন।

حق تقوى (যথাযথ তাকওয়া) ইহার এক অর্থ এই যে, যে তাকওয়া খোদার শানের যোগ্য— সেইরূপ তাকওয়া অবলম্বন কর, আয়াতে এই অর্থ বুঝানো হয় নাই। কারণ, এইরূপ তাকওয়া অবলম্বন করা মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। ইহা تكليف مالايطاق 'সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেওয়া' ছাড়া কিছুই নহে।

ইহার অপর অর্থ এই যে, মানুষের সাধ্যানুযায়ী যে তাকওয়া খোদার শানের যোগ্য, উহা অবলম্বন কর। বলা বাহুল্য, আয়াতে এই অর্থই বুঝানো হইয়াছে। এই প্রকার তাকওয়া মানুষের সাধ্যাতীত নহে। তথাপি প্রথম পর্যায়েই এই স্তরে পৌঁছিয়া যাওয়া মানুষের পক্ষে সুকঠিন।

ছাহাবাদের চিন্তিত হওয়ার কারণ ইহাই ছিল। তাঁহারা দেখিলেন, এই স্তরটি যদিও সাধ্যাতীত নহে, তথাপি প্রথম দিনেই এই তাকওয়া অর্জন করা মুশকিল। তাঁহারা فَاتَّقُوا اللهَ নির্দেশসূচক পদ হইতে ইহাও বুঝিলেন যে, বিষয়টি এক্ষণি অর্জন করিতে বলা হইয়াছে। এজন্য নহে যে, আদেশসূচক শব্দ দ্বারা অবিলম্বে কাজ সমাধান করা বুঝায়; বরং সাধারণ বাক-পদ্ধতিতে ইহা প্রায়ই এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া আদেশ-নিষেধ পালনের ব্যাপারে ছাহাবাদের দৃষ্টি সর্বদা নিঃসন্দেহ দিকের প্রতি থাকিত। এই কারণে তাঁহারা আদেশকে অবিলম্বে অর্থে বুঝিয়া লইলেন।

www.BANGLAKITAB.com

আয়াতের এই আদেশটি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া করা হইলে আমরা মোটেই শঙ্কিত হইতাম না। আমরা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লইতাম—আদেশে দ্রুততা বুঝায় না। কাজেই যথাযথ তাকওয়ার নির্দেশ দানের অর্থ এই নয় যে, এক্ষণি এই তাকওয়া অর্জন করিতে হইবে; বরং আস্তে আস্তে অর্জন করিলেও চলিবে। ছাহাবাদের মনেও এই ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই উপস্থিত ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত খোদাভীতি ও সাবধানতার কারণে তাঁহারা আদেশকে দ্রুততার অর্থেই বুঝিয়া লইয়াছেন। কেননা, বাক-পদ্ধতিতে অবিলম্বে পালন অর্থেই আদেশের ব্যবহার বেশী।

আপনি যদি চাকরকে পানি আনিতে আদেশ দেন, আর সে পরের দিন পানি আনিয়া দেয়, তবে আপনি রাগান্বিত হইবেন নাকি? নিশ্চয়ই হইবেন। ইহার উত্তরে চাকর যদি বলে, হুযূর, শুধু 'পানি আন' বলিয়াছিলেন, এখনই আন বলেন নাই। তবে চাকরের এই ওযর গ্রহণযোগ্য হইবে না। কারণ, এই স্থানে ধরন পদ্ধতিতে বুঝা যায় যে, এখানে আদেশ (امر) দ্রুততা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তদ্রূপ অধিকাংশ আদেশ (امر) পদের ব্যবহার দ্রুততা অর্থেই হইয়া থাকে।

একটি রসাত্মক গল্প ঃ এক্ষেত্রে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল। আমাদের এলাকায় 'হাফেয জানাযা' পদবীধারী জনৈক হাফেয সাহেব ছিলেন। তিনি গ্রামের একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন। একদিন গ্রামবাসীরা একটি জানাযা মসজিদে আনিয়া ইমাম সাহেবকে নামায পড়াইতে বলিলে তিনি এই বলিয়া অজুহাত পেশ করিলেন, এক্ষণে একটি দো'আয় সামান্য সন্দেহ আছে। উহা উত্তমরূপে মুখস্থ করিয়া নামায পড়াইয়া দিব। অগত্যা গ্রামবাসীরা জানাযা লইয়া চলিয়া গেল এবং অন্য ইমাম দ্বারা নামায পড়াইয়া মৃতকে দাফন করিয়া দিল। পরদিন হাফেয সাহেব গ্রামবাসী-দিগকে বলিলেন, ভাই এবার দো'আটি মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। জানাযা কোথায়? আন দেখি নামায পড়াইয়া দেই। তাহারা হাস্য সহকারে উত্তর দিল, সোবহানাল্লাহ্, আপনি মনে করিতেছেন যে, আপনার দো'আর ভরসায় আমরা জানাযা আচার (চাটনী) বানাইয়া রাখিয়াছি। আমরা তো গতকল্যই তাহা কবরস্থ করিয়া ফেলিয়াছি।

দেখুন, দ্রুততা ও অদ্রুততা—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য না বুঝার ফলেই সকলে হাফেয সাহেবকে বোকা বানাইয়াছে। এর পর হইতেই তাহার সহিত 'হাফেয জানাযা' উপাধিটি যুক্ত হইয়া যায়। ছাহাবাগণ উপরোক্ত আয়াতখানি দ্রুততা অর্থে বুঝিয়া মনে করিলেন যে, অদ্যই 'যথাযোগ্য তাকওয়া' অবলম্বন করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কাজেই খোদার এই নির্দেশটি কিরূপে পালিত হইবে? ইহাতে অপর একখানি আয়াত নাযিল হয় ঃ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ, 'যথাযোগ্য তাকওয়া' অদ্যই হাছিল করা উদ্দেশ্য নহে; বরং উদ্দেশ্য হইল—যতটুকু তাকওয়া অবলম্বন করা তোমাদের দ্বারা সম্ভব—এক্ষণে ততটুকুই অবলম্বন কর। এর পর উন্নতি করিতে থাক এবং 'যথাযোগ্য তাকওয়া' পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাও।

নস্‌খ (শরীঅতের আদেশ নিষেধ রহিতকরণ)-এর অর্থ ঃ এই আলোচনায় ছাত্রদের মনে সন্দেহ জাগিতে পারে যে, ইহাতে বুঝা যায়, প্রথমোক্ত আয়াত ঃ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ এখনও কার্যকরী আছে এবং উহা পালন করার আদেশ বহাল রহিয়াছে। অথচ হাদীসদৃষ্টে জানা যায় যে, পরবর্তী আয়াত ঃ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অবতীর্ণ হওয়ায় ঐ আয়াত রহিত হইয়া গিয়াছে।

ছাত্রদের জানা উচিত যে, পূর্ববর্তীদের পরিভাষা অনুযায়ী 'নস্‌খ'-এর অর্থ শুধু পরিবর্তন ও রহিতসাধনই নহে; বরং তাহারা ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় বর্ণনাকেও 'নস্‌খ' বলিতেন। কাযী ছানাউল্লাহ্ সাহেব তফসীরে মাযহারীতে এই তথ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম তথ্য,

www.BANGLAKITAB.com

খোদা তাঁহাকে সমুচিত পুরস্কার দান করুন; সুতরাং আলোচ্য আয়াতসমূহে বলিতে হইবে যে, اِتَّقُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ আয়াতখানি নাযিল হইয়া প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে। হাদীসে এই ব্যাখ্যাকেই 'নস্‌খ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। নতুবা আমি فاتقوا الله حق تقاته আয়াতের যে অর্থ বর্ণনা করিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই রহিত হওয়ার যোগ্য নহে।

ছাত্রদের আরও একটি বিষয় জানা উচিত যেঃ اتقوا الله مااستطعتم আয়াতে যে সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—ইহার অর্থ এই নয় যে, যে পরিমাণে আমল পালন করিতে পার, পালন কর এবং যে পরিমাণ হারাম কাজ হইতে বাঁচিতে পার বাঁচিয়া থাক। তোমরা এতটুকুরই আদিষ্ট। এই অর্থ সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপ্রসূত। কেননা, শরীঅতের যাবতীয় ওয়াজিব ও ফরয কর্তব্য পালন করা এবং যাবতীয় হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা প্রত্যেকের উপরই ফরয। এই মুহূর্তেই সকলে এই সব বিষয়ে আদিষ্ট। ইহাদের মধ্য হইতে কোনটিই সামর্থ্যের বাহিরে নয়। আয়াতে উল্লিখিত সামর্থ্যের অর্থ এই যে, শরীঅতের আমলসমূহে যে ধরনের তাকওয়া তোমরা এখন অর্জন করিতে পার—তাহা এখনই অর্জন কর এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত ধরনের তাকওয়া অর্জন করার জন্য সচেষ্ট থাক। ইহাতে বুঝা যায় যে, ধরন হিসাবে তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে—পরিমাণ হিসাবে নয়।

এই আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতে ছিদ্‌ক পরে ও তাকওয়া আগে উল্লেখ করাই বেশী সঙ্গত। ইহাতে শ্রোতাদের মনের উপর বোঝা চাপিয়া বসে না; বরং অধিকতর উৎসাহের সঞ্চার হয়। তাহারা মনে করিতে পারে যে, আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে তাকওয়ার স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া পূর্ণ তাকওয়া পর্যন্ত পৌঁছিতে হইবে।

আমি এই পর্যায়ে আলোচনা শেষ করিতেছি। সারকথা এই যে, পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। উহার উপায় হইল আমলে পূর্ণতা অর্জন করা, ফরয ও ওয়াজিব পালনে ত্রুটি না করা, হারাম কার্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং আমল কামেল করার সময় নফ্‌সে যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, কামেল ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকিয়া উহার প্রতিকার করা। কামেল ব্যক্তিদের দরবারে উপস্থিত হওয়া উচিত। ইহা সম্ভব না হইলে তাঁহাদের সহিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান রাখা দরকার। চিঠিপত্রে অনর্থক গল্প-গুজব লেখা সমীচীন নহে; বরং নিজকে রোগী ও তাহাদিগকে চিকিৎসক মনে করিয়া নিজের যাবতীয় অবস্থা জানাইতে থাকা উচিত। এর পর তাঁহারা যে সব উপদেশ দেন, সযত্নে তাহা অনুসরণ করা প্রয়োজন। খোদা পর্যন্ত পৌঁছিবার ইহাই সহজ পথ। ইহা হইতে সহজ পথ আর কেহ বলিতে পারিবে না। ওযরের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন দো'আ করুন, যেন হক তা'আলা আমাদিগকে সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধি ও সহজ আমলের তওফীক দান করেন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○

www.BANGLAKITAB.com

ধর্মের প্রতি মনোযোগ দানের আবশ্যকতা

ধর্মের প্রতি মনোযোগ দানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ৩রা যিলকদ ১৩২৯ হিজরী তারিখে মাদ্রাসা 'এহ্ইয়াউল উলূম' এলাহাবাদে প্রায় এক হাজার শ্রোতার সম্মুখে উপবিষ্ট অবস্থায় হযরত থানভী (রঃ) এই ওয়ায বর্ণনা করেন। প্রায় আড়াই ঘন্টায় ইহা শেষ হয়। মাওলানা সাঈদ আহ্মদ থানভী ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে একটি মারাত্মক রোগ দেখা দিয়াছে। তাহা হইল ধর্মের প্রতি অমনোযোগিতা। এই রোগের ফলস্বরূপ আজ আমরা মুসলমান বলিয়া পরিচিত হওয়ার যোগ্য নহি এবং ধর্মের অধিকাংশ বিষয় আমাদের আমল হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আমরা না তো আকায়েদের পরওয়া করি, না আমল ভাল করার চেষ্টা করি এবং না পরস্পরে উত্তম চালচলনের প্রতি লক্ষ্য করি, না দুশ্চরিত্রতার জন্য দুঃখ করি! এখন আপনি নিজেই ভাবিয়া দেখুন, আমাদের অবস্থা ইসলামের কতদূর নিকটবর্তী এবং উহার সহিত কতখানি সামঞ্জস্যশীল।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّابَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ـ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ — سورة بقره ايت ١٢٩

"হে পরওয়ারদেগার! এই দলের মধ্যে তাহাদেরই একজনকে এমন রাসূল নির্দিষ্ট করুন—যিনি তাহাদিগকে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইবেন, তাহাদিগকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন। নিশ্চয়, আপনিই মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।"

ধর্মীয় লাভই প্রকৃত লাভ

ইহা একখানি আয়াত। কোরআন শরীফে ইহার সমার্থবোধক আরও আয়াত রহিয়াছে। সেগুলিতেও এই আলোচ্য বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত

www.BANGLAKITAB.com

ইসমাঈল (আঃ)-এর বাচনিক এই বিষয়টি বিবৃত হইয়াছে। কা'বা নির্মাণের সময় তাঁহারা যে সব দো'আ করিয়াছিলেন, এই দো'আটি উহাদের অন্যতম। তাঁহাদের পরবর্তী বংশধরগণ এই দো'আর ফল লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ নিজের জন্য ও পরে সন্তান-সন্ততিদের জন্য দো'আ করেন। সন্তানদের জন্য যে সব দো'আ করেন, উদ্ধৃত আয়াতের দো'আটি উহাদের পর্যায়ভুক্ত।

এই দো'আর সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) আপন সন্তানদিগকে একটি ধর্মীয় উপকার পৌঁছাইয়াছেন। এই দো'আর ধারাদৃষ্টে বুঝা যায় যে, ধর্মীয় উপকারই প্রকৃত ও প্রণিধানযোগ্য উপকার এবং সাংসারিক উপকার উহার অধীন ও উহার সহিত যুক্ত। হযরত ইবরাহীমের এই কার্যক্রম হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তিনি যেমন আপন বংশধরদের সাংসারিক মঙ্গলের জন্য দো'আ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেনঃ

وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ *

"এই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা খোদার উপর ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনে, তাহাদিগকে বিভিন্ন ফলমূল দান কর।" তদ্রূপ তাহাদের ধর্মীয় মঙ্গলের জন্যও দো'আ করিয়াছেন। সাংসারিক মঙ্গলের জন্য দো'আ করায় বুঝা যায় যে, ইহাও কম জরুরী নহে। তাছাড়া ইহা জানা কথা যে, দুনিয়ার মঙ্গল সাধিত না হইলে খুব কম সংখ্যক লোকই খোদার প্রতি মনোযোগ দিতে পারে। অতএব, রুযি-রোযগার বৃদ্ধির সহিত স্বাস্থ্যের জন্যও খোদার নিকট দো'আ করা উচিত।

এই কারণেই হুযূর (দঃ) একদা জনৈক ছাহাবীকে খুব দুর্বল হইয়া পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'তুমি দো'আ করিয়াছ কি?' ছাহাবী উত্তর দিলেন, 'হাঁ, করিয়াছিলাম।' হুযূর (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "কি দো'আ করিয়াছিলে?" উত্তর হইল, আমি দো'আয় বলিয়াছিলাম, হে খোদা! আমাকে শাস্তি যাহা দিবার হয়, দুনিয়াতেই দিয়া দাও। ইহাতে হুযূর (দঃ) ছাহাবীকে সতর্ক করিয়া দেন। নিঃসন্দেহে ইহা মারাত্মক ভুল। কেননা, মানুষ দুর্বল এবং জন্মগতভাবে সে অপরের প্রতি নির্ভরশীল।

জনৈক ব্যক্তি একদা আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমার খুব বেশী দরকার, দশটি টাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিন। সে এদিক ওদিকের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল এবং নিজেকে দুনিয়াত্যাগী সাধু যাহির করিয়া বলিতে লাগিল; জান্নাতের কি পরওয়া, দোযখেরই বা কি ভয়? আমি বলিলাম, মিয়া থাম, তুমি দশ টাকার ব্যাপারেই যখন ধৈর্য ধরিতে পারিলে না, তখন জান্নাতের ব্যাপারে কি ধৈর্য ধরিবে? এতই অমুখাপেক্ষী হইলে দশ টাকার ব্যাপারেই ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে।

বাস্তবিক, মানুষ এতই মুখাপেক্ষী যে, তাহার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিই প্রয়োজন; বরং দুনিয়া অপেক্ষা আখেরাতের বেশী মুখাপেক্ষী। এই কারণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) দুনিয়ার জন্য দো'আ করার সাথে সাথে আখেরাতের জন্যও দো'আ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, আমাদিগকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেই তিনি এইরূপ করিয়াছেন।

এখানে 'আওলাদ' (সন্তান) ব্যাপক অর্থে মনে করিতে হইবে। প্রকৃত সন্তান হউক কিংবা ধর্মীয় সন্তান হউক। অনুসরণ ব্যতীত প্রকৃত সন্তানও সন্তান হইতে পারে না। তাই হাদীসে বলা হইয়াছে, مَنْ سَلَكَ طَرِيْقِيْ فَهُوَ اِلَيَّ 'আমার পরিবারবর্গের মধ্যে যে আমার মনোনীত পথে চলে, সেই